STUDY MATERIALS

UG/SEMESTER : 4

CC-8 , CODE : BNGACOR08T

UNIT : 1 মেঘনাদবধ কাব্য(প্রথম – ষষ্ঠ সর্গ)

মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচন

রাজনারায়ণ বসু

আরবদিগের মধ্যে এইরূপ প্রথা আছে যে, তাহাদিগের দেশে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ঘোটক বা উষ্ট্র জন্মিলে অথবা তাহাদিগের বংশে একজন উৎকৃষ্ট কবির উদয় হইলে তাহারা আনন্দোৎসব করিয়া থাকে। একজন কবিকে ঘোটক বা উষ্ট্রের ন্যায় পশু বলিয়া গণ্য করা আমাদিগের অভিপ্রায় নহে, কিন্তু আমাদিগের মতে স্বদেশে একটি মহাকবির উদয় জাতিসাধারণের আনন্দের কারণ বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই শ্রেণীর কবি। তিনি একখানি খণ্ডকাব্যে যে বঙ্গভূমিকে "শ্যামা জন্মদে" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, সেই বঙ্গভূমি তাঁহাকে প্রসব করিয়া প্রকৃত গৌরবাস্পদই হইয়াছেন। বর্ণনার ছটা, ভাবের মাধুরী, করুণরসের গাঢ়তা, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার নির্ব্বাচন-শক্তি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য অনুধাবন করিলে তাঁহার 'মেঘনাদবধ' বাঙ্গালা ভাষায় অদ্বিতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। মিল্টন ও বাল্মীকিতে এবং তাঁহাতে যদিও অনেক অন্তর, কিন্তু তিনি এই মহাকবিদিগের দৃষ্টান্তানুসরণে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিতে হইবে। তাঁহার কাব্যে ইউরোপ ও এসিয়ার মহাকবিদিগের অনুকরণের প্রাচুর্য দেখা যায় সত্য বটে, কিন্তু তিনি যাহা অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা নূতন বেশে সুশোভিত করিয়াছেন। এ প্রকার অনুকরণ দূষণীয় হইলে মিল্টনের ন্যায় কবিও বহু নিন্দার্হ হয়েন। দত্তজ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছেন কেবল ইহা-দ্বারাই তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই কাব্যের প্রধান গৌরব এই যে, ইহার হিন্দু-আকার প্রায় সকল স্থানে রক্ষিত হইয়াছে, অথচ সকল স্থানে ইউরোপীয় বিশুদ্ধ রুচি প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই কাব্যটি এসিয়া-রূপ জনয়িতা ও ইউরোপ-রূপ জনয়িত্রীর সন্তান-স্বরূপ। বঙ্গভাষায় এই কাব্যের দোষ-গুণ-সমালোচনা বঙ্গভাষার একটি প্রধান অভাব। পশ্চাদ্বর্ত্তী কয়েক পংক্তি-দ্বারা এই অভাব পূরণার্থ যথাকথঞ্চিৎ চেষ্টা করা যাইতেছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের আরম্ভ সৌন্দর্য্য-রস-পূর্ণ। কবি স্বদেশীয়দিগকে যে অমৃত পরিবেশন করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন[১] ইহা হইতে তাহার পূর্ব্বাস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে রাবণের সভা-বর্ণনা অতিশোভন। বীরবাহু-শোকে রাবণের বিলাপ অকৃত্রিম করুণরসার্দ্র এবং সরল উৎপ্রেক্ষায় পরিপূর্ণ। মকরাক্ষ, বীরবাহু ও রামের যে যুদ্ধ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ বীররসাত্মক এবং তাহা পাঠ করিয়া আমরা কবির স্ব-বাক্যে তাঁহাকে সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না—"ধন্য শিক্ষা তব কবিবর!"—আর্য্য ও সেমিটিক মিশ্র ভাবগর্ভ[২] পশ্চাল্লিখিত বর্ণনাটি কেমন গম্ভীর :

"———নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে!"

অনুপ্রাস-গুণ এই পংক্তিটির সৌন্দর্য্য অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা যথোপযুক্ত ভয়ঙ্কর হইয়াছে এবং অনল্প কবিত্ব-শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া রাবণ যে শ্লেষোক্তি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট প্রশংসার্হ।

"ক্ষোভে, রোষে, দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীমরূপী—"

কেমন স্বভাব-সঙ্গত চিত্র! কবি যে করুণরসে বিশেষ সুনিপুণ, রাবণের প্রতি চিত্রাঙ্গদার উক্তি, তাহার আর একটি উদাহরণ।

১। ————গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

২। আর্য্য—হিন্দু; সেমিটিক—ইহুদীয়

"বরজে সজারু পশি বারুইর যথা"—ইত্যাদি উপমাটি পাইলে হোমরও সৌভাগ্য জ্ঞান করিতেন। রাক্ষসগণের রণসজ্জার বর্ণনা দেখিলে কবির প্রগাঢ় বীররস-বর্ণনা-শক্তি বিলক্ষণ অনুভূত হয়। বারুণীর মুক্তালঙ্কৃত কেশপাশ হোমরকে পুনরায় স্মরণ করিয়া দেয়। মেঘনাদের প্রমোদোদ্যানের বর্ণনা :

"—কুহরিছে ডালে
কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি;
বিকশিছে ফুলকুল; মর্ম্মরিছে পাতা;
বহিছে বাসন্তানিল; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর।—"

কয়েকটি অনুপম চিত্রচ্ছটায় রঞ্জিত হইয়া কি সুন্দর হইয়াছে।

"—নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;"—ইত্যাদি

এই হৃৎ-চিত্র-পূর্ণ রাক্ষসবন্দিগণের গান যে কতদূর প্রশংসনীয় বলিতে পারি না।

"বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস;—
পূরিল কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।"

এই দুই পংক্তি অত্যুৎকৃষ্ট রচনা-শক্তির একটি উদাহরণ। শব্দ-বিন্যাসের যদি কিঞ্চিৎমাত্র অন্যথা হয়, ইহার সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রথম সর্গ এইরূপ প্রভূত অলঙ্কাররাজিতে সুসজ্জিত।

দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে সন্ধ্যা-বর্ণনাটি যারপরনাই মনোহর। অমরবৃন্দের আমোদ-প্রমোদ ইহা অপেক্ষা ন্যূনতর নহে, ইহা পাঠকালে হোমরকে স্মরণ হয়। শিব, দুর্গা, কামদেব ও রতির উপন্যাসে হোমরোপম সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয়। কামদেব ও রতি হোমরের ভল্কান ও আফ্রোডিটীর অনুরূপ। শিব ও দুর্গার চতুর্দ্দিকস্থ স্বর্ণ-রঞ্জিত মেঘ এবং পুষ্পমালা-পাঠে হোমরের পশ্চাল্লিখিত বর্ণনাটি স্মৃতি-পথারূঢ় হয়।

"হেন ভাবি জোভ, দুই বাহু পসারিয়া
আলিঙ্গিলেন ধর্ম্মপত্নী,—সর্ব্ব দেবমাতা।
যুগল মূরতি ঊর্দ্ধে নিয়ে বসুন্ধরা,
প্রসবে নবীন শষ্প নয়ন-রঞ্জন,
শিশির মুকুতাফলে সজ্জিত কমল,
প্রফুল্ল রজনীগন্ধা, জাফরান দল;
কোমল কুসুমগুচ্ছ হ'য়ে শয্যাধান,
কঠিন পৃথিবী হ'তে ব্যবধিল দোঁহে,
বিরমে দম্পতি তথা, সুবর্ণ মণ্ডিত
সৃজিলা জলদ এক, জ্যোতির্ম্ময় প্রভা,
দর দর ঝরে তাহে শিশিরের ধারা।" হোমর ১২শ সর্গ ৩৪৬-৫৬ পং।

কামদেব দগ্ধ শরীরে শিবের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলে রতি তাঁহার প্রতি যে কথা বলেন, তাহা দাম্পত্য-প্রণয়পূর্ণ। এই সর্গে ঝটিকা-বর্ণনা যারপরনাই প্রশংসনীয়। বায়ুকর্তৃক গুহা হইতে ঝঞ্ঝাসকলের উন্মোচন-পাঠে বর্জিলের ইওলাসের কথা মনে হয়।

তৃতীয় সর্গে প্রমীলার উদারচিত্ততা দেখিলে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার যুদ্ধ-সজ্জা ও যুদ্ধ-

যাত্রার বর্ণনা চমৎকার। চতুর্থ সর্গের প্রথমেই বাল্মীকির প্রতি সম্বোধন যথার্থই অতি মনোহর :

"রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে!"

এবং বাল্মীকির 'রত্নাকর' নামোল্লেখও মনোহর হইয়াছে। এই সর্গে সীতার শোচনীয় দুরবস্থা যেরূপ করুণরসের সহিত সেইরূপ ভাবের সৌন্দর্য্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে, তাহার উপযুক্তরূপ প্রশংসা কি প্রকারে করিব ভাবিয়া পাই না। ইহা যতবার পাঠ করিয়াছি অশ্রুপাত সম্বরণ করিতে পারি নাই। করুণ ও শোকরস-বর্ণনা-শক্তি আমাদিগের কবির বিশেষ গুণ, এতদ্ভিন্ন তিনি তাঁহার কাব্যের অনেক স্থলে বীররসের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেও বঙ্গীয় সকল কবি অপেক্ষা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। যে কুঞ্চিকাদ্বারা সহানুভূতির অশ্রু-দ্বার উন্মুক্ত করা যায়, প্রকৃতিদেবী তাহা ভারতীয় অনেক কবি অপেক্ষা তাঁহাকে বিশেষরূপে দান করিয়াছেন। এ বিষয়ে বাল্মীকি তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রদেয় সকল বর অপেক্ষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বরে আমাদিগের কবিকে ভূষিত করিয়াছেন। পঞ্চবটী বনে স্বামীর সহিত সীতার সুখভোগ-বর্ণনায় যেরূপ বন্য-সরলতা এবং আনন্দকর বিজনবাস বিবৃত হইয়াছে তাহার প্রশংসা বাক্যাতীত। সীতার এই অবস্থা ও তাঁহার ভাবী দুরবস্থা পরস্পর কেমন বিভিন্ন! এই সমুদয় বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারি :

"শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাস,[৩]
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে!"

পঞ্চম সর্গের প্রারম্ভে অপ্সরাদিগের নিদ্রাকর্ষণ-বর্ণনা অতি চমৎকার। স্বর্গীয় অপ্সরাগণের সরোবর-স্নান-বর্ণনাতে যেরূপ অত্যুজ্জ্বল অপরিমেয় কল্পনা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইটালীয় কবিদিগের লেখনীযোগ্য এবং আরবীয় উপন্যাসে অদ্ভুতভাবে চিত্রিত! প্রমীলাকে জাগ্রত করিবার সময় মেঘনাদের সম্বোধনটি মাধুরী ও লালিত্যে মিল্টনের ইবের প্রতি আদমের উক্তির সমতুল্য।

ষষ্ঠ সর্গে লঙ্কার নাগরিকগণের প্রবোধন এবং নগরের ক্রমোত্থিত কোলাহল ও ব্যস্ততা অসামান্য কবিত্বের পরিচায়ক। বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের ভর্ৎসনাবাক্যসকল ভয়ঙ্কর হৃদয়ভেদী এবং সম্পূর্ণরূপে অখণ্ডনীয়। মেঘনাদের পতনে বিভীষণের বিলাপ অত্যন্ত শোকোদ্দীপক।

সপ্তম সর্গ প্রাতঃকালের রমণীয় বর্ণনার সহিত আরব্ধ। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিটি পাঠে আমি বিমোহিত হইয়াছি;

"কুসুম কুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।"

কবির প্রভাত ও সন্ধ্যা-বর্ণনা' বিশেষ মনোহর। প্রমীলার বক্ষঃস্থ মুক্তামালার সহিত শরৎকালীন মেঘে চন্দ্রের রজতচ্ছটার তুলনা অতিশয় সুন্দর হইয়াছে। এইস্থানের অনেকগুলি উপমা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর উপমার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। আমি এই সমালোচনায় রাশি রাশি নিরুপম উপমার মধ্যে কয়েকটি মাত্র উপমা সঙ্কলন করিয়াছি। রাক্ষসদিগের রণসজ্জা বর্ণনা যারপরনাই উৎসাহকর এবং যথার্থ হোমরোপম। যুদ্ধ-বর্ণনাও ন্যূন নহে; ইহা পাঠ করিলে হোমরের যে সর্গে গ্রীক্ ও ট্রোজানদিগের যুদ্ধে দেবগণের পরস্পরের পক্ষাবলম্বন বর্ণিত আছে, তাহা স্মরণ হয়। কিন্তু আমাদিগের কবির দেবগণ প্রকাণ্ডদেহ ও অসুন্দরাকৃতি হইলেও হোমরের দেবতাদের ন্যায় বালকবৎ

৩। এই পংক্তির শেষাংশ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত।

সম্ভাষণ বা আচরণ করেন নাই। তিনি বানরদিগের কার্য্য মানব-বীরদিগের ন্যায় বর্ণনা করিয়া সভ্য রুচির পরিচয় দিয়াছেন।

অষ্টম সর্গে লক্ষ্মণের মৃত্যুতে রামের বিলাপ-বর্ণনা অতিশয় করুণরসার্দ্র, এবং বাল্মীকি-রচিত তদ্বিষয়ক একটি বর্ণনার অনুরূপ। এই সর্গের নরক-বর্ণনা অনেক স্থলে প্রথম শ্রেণীর কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দেয়। ইহাতে হোমর, বর্জিল, দান্তে, মিল্টন এবং ব্যাসের কবিতার অনেক অনুকরণ আছে, কিন্তু আমি অনেকবার বলিয়াছি যে, আমাদিগের কবি নিরবচ্ছিন্ন অনুকরণকারী নহেন। মিল্টন যেরূপ অন্যান্য কবির অনুকরণ করিয়াছেন, তিনিও সেইরূপ করিয়াছেন।

নবম সর্গে প্রমীলা তাঁহার মৃত পতির নিমিত্ত আর্ত্তনাদ করিতেছেন এরূপ বর্ণনা না করিয়া কবি বিশুদ্ধ রুচি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার গভীর শোক কি বাক্য-দ্বারা ব্যক্ত করা যায়? যে মায়াবী পুরুষের কুহকে সংসারারণ্য তাঁহার নিকট কুসুমোদ্যানবৎ প্রতীত হইতেছিল, তাঁহার বিয়োগে সকলই ঘোরতর শূন্য বোধ হইল; বিলাপ ও অশ্রুপাত এ-প্রকার শোকের অতি সামান্য নিদর্শন। এই সর্গে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সজ্জা বর্ণনা অতি শোভন ও হৃদয়গ্রাহী।

এক্ষণে কাব্যের দোষসকলের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ—ভাবের পরস্পর অনৈক্য। (১) কবি স্বদেশীয় লোকদিগের মনোরঞ্জনার্থে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতি যতদূর সাধ্য মমতা প্রদর্শন করিতে ক্রটী করেন নাই; কিন্তু রাক্ষসদিগের প্রতি তাঁহার আন্তরিক পক্ষপাতও গোপন রাখিতে পারেন নাই। মিল্টনের ক্রাইষ্ট্ অপেক্ষা সেটান, নায়ক নামের অধিক উপযুক্ত কিন্তু আমাদিগের কবিতে ও তাঁহাতে প্রভেদ এই যে, মিল্টন অজ্ঞাতসারে এই প্রমাদে পড়িয়াছিলেন; আমাদিগের কবি জানিয়া শুনিয়া ঐ প্রমাদে পড়িয়াছেন। ইন্দ্রজিতের অন্যায় হত্যা-সাধনান্তে লক্ষ্মণের প্রতি রামের পশ্চাল্লিখিত উক্তিটি শ্লেষোক্তি-প্রায় বোধ হয় :

"লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,
হে বাহুবলেন্দ্র! ধন্য বীরকুলে তুমি!" ইত্যাদি।

লক্ষ্মণ কি বাহুবলই প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করিয়াছিলেন! ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে কবি,

"বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,
শার্দ্দূলী অবর্ত্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ" ইত্যাদি

এই উপমা-দ্বারা রাক্ষসদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কাব্যের সর্ব্বাংশে কবির মত স্পষ্ট এবং অবিসম্বাদিত হওয়া উচিত ছিল। (২) কোন কোন স্থলে সরল এবং অসরল বর্ণনা একত্র মিশ্রিত হইয়াছে—যথা, ১ম সর্গ ৩২৯-৩৪২ পংক্তি, এবং ৭ম সর্গ ১৫৮-১৯১ পংক্তি। প্রথমোক্ত স্থলে চিত্রাঙ্গদা ও তাঁহার সহচরী রাক্ষস-সুন্দরীগণের মুক্তকেশপাশ ও নিশ্বাস, প্রলয় মেঘমালা ও প্রলয় ঝটিকার সহিত তুলনা এবং শেষোক্ত স্থলে রাবণের স্ত্রী-সেনানীগণের দন্তের সহিত তোমর, ভোমর, শূল ইত্যাদির তুলনা এবং অঞ্চলের সহিত পতাকা ইত্যাদির তুলনা-দ্বারা উক্ত স্থলসকলের হোমরোপম সরলতা বিনষ্ট হইয়াছে। প্রকৃত সুকল্পনা এবং মিথ্যা আড়ম্বরের পরস্পরের এ-প্রকার সংমিশ্রণ পরিত্যাগ করা উচিত। (৩) এক স্থানে বিপরীত ভাবোদ্দীপক অভিপ্রায়সকলও মিশ্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গের উপসংহারে কবি,

"তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
রজোময়,"

ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা শান্তির সুন্দর বর্ণনা করিয়া হঠাৎ,

"আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে শিবা
শবাহারী পালে পালে গৃধিনী, শকুনি;
পিশাচ"

এই বীভৎস বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা-দ্বারা বর্ণনার মাধুর্য্য এককালে নষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় সর্গে কবি পাঠকগণের মনে ভয় ও আশ্চর্য্যভাব উদ্দীপনার্থ লঙ্কাবাসিনী বীর-রমণীদিগের রণ-সজ্জা ও যুদ্ধ-যাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু পশ্চাদ্বর্ত্তী বর্ণনায় সে ভাবের ব্যাঘাত হইতেছে।

"অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুম-ধনুঃ মুহুর্মুহু হানি
অব্যর্থ কুসুম-শরে!"

এই বর্ণনাতে সমুদায় বিষয়টি লঘু হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চাদ্বর্ত্তী কয়েকটি পংক্তি হাস্যকর :

অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?

* * * *

দেখিব, যে রূপ দেখি সূর্পণখা পিসী
মাতিল, মদন-মদে পঞ্চবটী বনে;"

এরূপ ভাষা স্ত্রীশোভন বটে, কিন্তু ক্রোধ-জ্বলিত সমরোৎসাহিত বীরাঙ্গনার যোগ্য নহে। বর্ণনার কোন কোন স্থল বিরুদ্ধ ভাবের উদ্দীপন করিয়া দেয়। এই কাব্যের অতি সাধ্বী নারী-চরিত্রও বিলাসিতার কলঙ্কে দূষিত হইয়াছে। এক স্থলে সীতা লঘুচিত্ত, আমোদপ্রিয়, চপল বালিকার ন্যায় হরিণদিগের সহিত নৃত্য করিতেছেন, কোকিলের সহিত গীতালাপ করিতেছেন এবং রসিক মধুমক্ষিকা ও ভ্রমরকে 'নাতিনী-জামাই' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।[৪] সীতার নম্রতা, অসাধারণ সতীত্ব এবং গম্ভীর প্রকৃতি বিষয়ে আমাদিগের যে চিরন্তন সংস্কার আছে, তাহার সহিত উপরি-উক্ত বর্ণনার ঐক্য হয় না। সত্য বটে, সংস্কৃত কাব্যে স্বামীর সম্মুখে রমণীগণের নৃত্য-গীতের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু আমাদিগের কবি সীতার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কেবল চতুরা, রসিকা নর্ত্তকীদিগের পক্ষে সম্ভব। অর্দ্ধ-বাতুল রমণীরাই হরিণদিগের সঙ্গে নৃত্য করিতে পারে।

"চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে!"[৫]

এই স্থলে অবিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম অকস্মাৎ আসিয়া কবি-বর্ণিত নিষ্কলঙ্ক দাম্পত্য প্রেমের বিশুদ্ধতা এককালে বিনষ্ট করিয়াছে। এটি অমার্জ্জনীয় দোষ। নিশ্চয়, মিল্টন কখন এরূপ লিখিতেন না। শেষ সর্গে :

"বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে;"[৬]

৪। "কভু বা
কুরঙ্গিণী-সঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি!
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে! ৪র্থ সর্গ ১৮৬-৯৩ পংক্তি

৫। ৫ম সর্গ ৩৮৭-৮৮ পংক্তি

৬। ৯ম সর্গ ২৯৫ পংক্তি

এই হাস্যকর পংক্তিটি আমাদের অতি প্রাচীন সাম্প্রদায়িক এবং প্রাচীন পদার্থের একান্ত পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগেরও প্রীতিকর হইবে না। এরূপ বর্ণনা মহাকাব্যের অনুপযোগী, বিশেষতঃ যে প্রকার উন্নত ও মহত্ত্বভাবপূর্ণ কবিতার সহিত সংযোজিত হইয়াছে তাহাতে ইহা নিতান্ত অসংলগ্ন হইয়াছে। (৪) এই প্রসঙ্গে হিন্দুভাব-বিরুদ্ধ কতকগুলি বর্ণনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সজ্জা প্রকৃত হিন্দু ব্যবহার-সঙ্গত নহে। ইহাতে ইউরোপীয় সামরিক সজ্জা, বর্ত্তমান বঙ্গীয় অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সজ্জা এবং সহমরণ-ক্রিয়ার সজ্জা একত্র বিমিশ্রিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ বর্ণনার অতি দীর্ঘতা। এই দোষের একটিমাত্র দৃষ্টান্ত আছে। নরক-বর্ণনায় এই দোষটি উপলক্ষিত হয়। নরক-রাজ্যে ভ্রমণ গ্রীস, রোম ও ভারতবর্ষীয় প্রাচীন কবিগণের একটি প্রিয় বর্ণনীয় বিষয়। আমাদিগের কবির পক্ষেও তাহা অল্প প্রলোভনকর নহে, কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহাকে তিনি অতিরিক্ত স্থান দান করিয়াছেন। বর্ণনাটি কাব্যের পরিমাণাধিক। বস্তুতঃ মেঘনাদবধ কাব্যের অবয়বোচিত হয় নাই।

তৃতীয়তঃ নীতি-গর্ভ মহাবাক্যের অভাব। মেঘনাদে এমন নীতি-গর্ভ মহাবাক্য অল্প আছে যে, তাহা দেশীয় লোকদিগের দ্বারা সামান্য কথোপকথনে উদ্ধৃত হইতে পারে। হোমর, বর্জিলের কত মহাবাক্য তাঁহাদিগের স্বজাতীয় সাধারণ জন-সমাজে সামান্য কথোপকথনে উদ্ধৃত হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে ভারতচন্দ্র আমাদিগের কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

যে সকল দোষের কথা উল্লেখ করা গেল, তাহার সকলগুলি ঠিক দোষ না হইতেও পারে, কারণ কোন কোন স্থলে আমার মত ভ্রমসঙ্কুল হইলেও হইতে পারে। যাহা হউক, উল্লিখিত দোষ সত্ত্বেও 'মেঘনাদ' বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য তাহার সন্দেহ নাই। অধিকন্তু দোষ ধরিলে 'প্যারাডাইস্ লষ্ট' কাব্যেও তাহা অল্প নাই। গোল্ডস্মিথ্ বলেন, "লেখকের গুণের আধিক্য স্থায়ী কীর্ত্তির যেরূপ নিদান, দোষের অল্পতা সেরূপ নহে। আমাদিগের অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থসকলও দোষগুণ উভয়েরই আশ্রয়, তাহাতে যেমন বিলক্ষণ গুণ আছে তেমনি বিলক্ষণ দোষও আছে।" মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক মেঘের অন্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধের সময় যেমন বীররসে পরিপূর্ণ হইতেন, কাব্যটিও সেইরূপ স্থানে স্থানে বীররসে পরিপূর্ণ; এবং সময়ান্তরে তিনি তাঁহার প্রমীলাকে জাগ্রত করিবার জন্য যেরূপ কোমল স্বর ধারণ করিতেন কাব্যটিও স্থানে স্থানে সেইরূপ কোমল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা কবিতা যেরূপ অসংস্কৃত অবস্থায় ছিল, তাহা দেখিয়া সে সময়ে কে বলিতে পারিত যে, এত অল্পকালের মধ্যে স্থল বিশেষে ভাবের উচ্চতায় প্রায় হোমরের ইলিয়েড্ ও মিল্টনের প্যারাডাইস্ লষ্টের ন্যায় এবং স্থল বিশেষে করুণরসে বাল্মীকির রামায়ণের সমকক্ষ একখানি অমিত্রাক্ষর বাঙ্গালা কাব্য প্রচারিত হইবে? ফলতঃ, সময় মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহে, কিন্তু মনুষ্যই সময়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। কাল মনুষ্যকে উচ্চ করিয়া তুলে না; মনুষ্য কালকে উচ্চ করিয়া তুলে। আমাদিগের কবি বঙ্গভাষাতে নূতন কবিতা-রচনা-প্রণালী ও অনেক নূতন শব্দ ও নূতন প্রয়োগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন অথচ অতি অল্প স্থলে তাঁহার কষ্ট-কবিত্ব-দোষ উপলক্ষিত হয়। তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের গেটে আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। গেটে যেমন অসম্পূর্ণ জর্ম্মন ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। মেঘনাদের রচনা-প্রণালী তিলোত্তমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল, মসৃণ, তরল ও শ্রুতিসুখকর। ইহার শব্দ-বিন্যাস অপেক্ষাকৃত সুপ্রশস্ত ও সুসংহত। আমরা যখনি ইহা পাঠ করি, তখনি ইহা নূতন বোধ হয়। অসাধারণ কবির রচনার প্রকৃত লক্ষণ এই যে, তাহা কখনই পুরাতন বা অরুচিকর হয় না। বহু শতাব্দী পরে যখন গ্রন্থকার এবং তাঁহার সমালোচক উভয়েই অন্তর্হিত হইবেন, তখনও মনুষ্যগণ

অক্লান্ত অনুরাগের সহিত মেঘনাদ পাঠ করিবে। অসাধারণ প্রতিভার কি রমনীয়—কি অক্ষয় প্রভাব! কত বংশ-পরম্পরা গত হইবে, তথাপি আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের যে-সকল স্থল পাঠ করিয়া অশ্রুপাত করিতেছি, লোকে সেই সকল স্থল পাঠ করিয়া অশ্রুপাত করিবে; তূরী-ধ্বনির ন্যায় যে-সকল স্থান বীরভাব উদ্দীপন করিয়া আমাদিগের হৃদয় প্রোৎসাহিত করিতেছে, তাহাদিগেরও করিবে; এবং যে-সকল স্থান আমাদিগের অন্তঃকরণকে প্রীতি ও কোমল-করুণরসে বিগলিত করিতেছে, তাহাদিগেরও তাহা সেইরূপ করিবে। আমাদিগের জাতীয় মানসিক প্রকৃতি সংগঠন পক্ষে মেঘনাদ যথেষ্ট সাহায্য করিবে। শাসনকর্তা বীরের ন্যায় কবির জয় সাড়ম্বর নয় বটে, কিন্তু তাহা সুনিশ্চয় ও সুদূর-ব্যাপ্ত। কবির ভাবসকল স্বজাতির মনোবৃত্তির উপাদান হয় এবং জাতীয় শিক্ষা ও মহত্ত্ব-সাধনের পক্ষে প্রভূত সহকারিতা করিয়া থাকে। ☐

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আজি বঙ্গভূমির উন্নতি সম্বন্ধে আর আমরা সংশয় করি না—এই ভূমণ্ডলে বাঙ্গালী জাতির গৌরব হইবে। কেন না বঙ্গদেশ রোদন করিতে শিখিয়াছে—অকপটে বাঙ্গালী, বাঙ্গালী কবির জন্য রোদন করিতেছে।

যে দেশে একজন সুকবি জন্মে, সে দেশের সৌভাগ্য। যে দেশে সুকবি যশঃ প্রাপ্ত হয়, সে দেশের আরও সৌভাগ্য। যশঃ, মৃতের পুরস্কার—জীবিতের যথাযোগ্য যশঃ কোথায়? প্রায় দেখা যায়, যিনি যশের পাত্র, তিনি জীবিতকালে যশস্বী নহেন; যিনি যশের অপাত্র, তিনি জীবিতকালে যশস্বী। সক্রেতিস্ এবং যীশুখ্রীষ্টের দেশীয়েরা, তাঁহাদিগকে অপমান করিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছিল। কোপরনিকস্, গেলিলীয়, দান্তে প্রভৃতির দুঃখ কে না জানে? আবার হেলি, সিওয়ার্ড প্রভৃতি মহাকবি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। এ দেশে, আজিও দাশরথি রায়ের একটু যশ আছে। যে দেশের শ্রেষ্ঠ কবি যশস্বী হইয়া জীবন সমাপন করেন, সে দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে যশস্বী হইয়া মরিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায়, যে বাঙ্গালা দেশ উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে।

বাঙ্গালা প্রাচীন দেশ। যাঁহারা ভূতত্ত্ববেত্তাদিগের মুখে শুনেন যে বাঙ্গালা, নদীমুখনীত কর্দ্দমে সম্প্রতি রচিত, তাঁহারা যেন না মনে করেন, যে কালি পরশ্ব হিমাচল পদতলে সাগরোর্ম্মি প্রহত হইত। সেরূপ অনুমান-শক্তি কেবল হুইলর সাহেবের ন্যায় পণ্ডিতেরই শোভা পায়। কিন্তু এই প্রাচীন দেশে, দুই সহস্র বৎসর মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষের কথা বিবাদের স্থল—নিশ্চয় স্থল হইলেও শ্রীহর্ষ বাঙ্গালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।

যদি কোন আধুনিক ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত ইউরোপীয় আমাদিগের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার ভরসা কি?—বাঙ্গালীর মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব, ধর্ম্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসূদন।

স্মরণীয় বাঙ্গালীর অভাব নাই। কুল্লুক ভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল! কেবলই কি বঙ্গদেশে?

আমাদের ভরসা আছে। আমরা স্বয়ং নির্গুণ হইলেও, রত্নপ্রসবিনীর সন্তান। সকলে সেই কথা মনে করিয়া, জগতীতলে আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ করিতে যত্ন কর। আমরা কিসে অপটু? রণে? রণ কি উন্নতির উপায়? আর কি উন্নতির উপায় নাই? রক্তস্রোতে জাতীয় তরণী না ভাসাইলে কি সুখের পারে যাওয়া যায় না? চিরকালই কি বাহুবলই একমাত্র বল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি কি বৃথায় হইতেছে? দেশভেদে, কালভেদে, কি উপায়ান্তর হইবে না।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন-ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ "শ্রীমধুসূদন।"

*বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ইংরাজী ভাষায়। তাহার বঙ্গানুবাদ এখানে প্রদত্ত হইল।**

* শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বঙ্কিম-জীবনী' থেকে গৃহীত। 'পুস্তক বিপণি' সংস্করণ।

গ্রন্থকারগণের মধ্যে অতঃপর মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথাই প্রথম বিবেচ্য। তিনি বিস্তর কবিতা নাটকের প্রণেতা। বোধ হয়, আর কোনও লেখকের দোষ গুণ সম্বন্ধে এত মতভেদ দৃষ্ট হয় না। কোনও কোনও ভাববিহ্বল সমালোচক তাঁহাকে কালিদাসের সহিত তুলনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন; আবার কেহ কেহ তাঁহাকে অতি নিকৃষ্ট লেখক বলিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। আমরা উক্ত দুই শ্রেণীর সমালোচকগণের মধ্যে কোনও শ্রেণীর সমালোচকের সহিত একমত হইতে পারি না। তাঁহার রচনায় বিশিষ্ট গুণ আছে, স্বীকার করি; কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা মহাকবিদিগের মধ্যে তাঁহাকে আসন প্রদান করিতে প্রস্তুত নহি। বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি নূতন পরিবর্ত্তন ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে অনেক কটু সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার ন্যায্য স্থান বোধ হয় সকলের উপরে।

তাঁহার কাব্যগ্রন্থ—'মেঘনাদবধ', 'তিলোত্তমাসম্ভব', 'বীরাঙ্গনা' এবং 'ব্রজাঙ্গনা'। প্রথমোক্ত দুইখানি যে শ্রেণীর কাব্য, তাহা য়ুরোপে 'এপিক্' নামে ও ভারতবর্ষে 'মহাকাব্য' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দুইখানিই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ রচনা এই প্রথম। দুইখানির মধ্যে 'তিলোত্তমা' প্রথমে রচিত; কিন্তু 'মেঘনাদবধ'ই দত্ত সাহেবের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যে রামায়ণ হইতে ভারতীয় বহু কবি রসসঞ্চয় করিয়া কৃতী হইয়াছেন, গ্রন্থের বিষয়টি সেই 'রামায়ণ' হইতেই গৃহীত—রাবণের সহিত রামের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রাবণের পুত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ও যোদ্ধা মেঘনাদ রামানুজ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক নিহত হন। আখ্যানবস্তুটি এই। কিন্তু দত্ত সাহেব বাল্মীকির নিকট গল্পটি অপেক্ষা অন্যান্য বিষয়ে অধিকতর ঋণী আছেন। তথাপি কাব্যখানি প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার নিজস্ব। দৃশ্যাবলী, পাত্রপাত্রীগণের চরিত্র-চিত্র, ঘটনাসংস্থান, এবং অবান্তর ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি অনেক অংশে দত্ত সাহেবের নিজস্ব সৃষ্টি। উহাদের উদ্ভাবনে ও ক্রমপরিণতিতে দত্ত সাহেব উচ্চ অঙ্গের কলাকুশলতা প্রদর্শিত করিয়াছেন। আমাদের যেটুকু স্থান আছে, তাহাতে বিস্তারিতভাবে কাব্যখানির সমালোচনা করা অসম্ভব। সুতরাং আমরা কবির কলাকুশলতার যথাযোগ্য বর্ণনা করিতে, বা পাঠকগণকে তাহার উপযুক্ত পরিচয় প্রদান করিতে অক্ষম। কেবল বাল্মীকি নহে, হোমর ও মিল্টনের নিকটও তিনি অনেক বিষয়ে ঋণী। কিন্তু যে সকল ভাব তিনি উক্ত কবিগণের নিকট সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা পরিপাক করিয়া তিনি তাঁহার নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন, এবং সমগ্রভাবে বিবেচনা করিলে, এই কাব্যগ্রন্থখানি আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান গ্রন্থ, সন্দেহ নাই। পাত্রপাত্রীগণের কল্পনা অতি সুপরিস্ফুট, এবং পাঠকের চিত্তমুগ্ধকর। ঘটনা-পরম্পরা যদিও অনেক স্থলে অতিলৌকিক, তথাপি অতি নিপুণ ও সহজ ভাবে সমাবিষ্ট হইয়াছে। রূপকাদি অলঙ্কারগুলি কোথাও মধুর, কোথাও করুণ, কোথাও বা রুদ্র-রসাশ্রিত। কল্পনার ক্রীড়া অনুক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল। ভাষা অত্যন্ত কবিত্বসম্পন্ন, এবং শব্দচয়ন এরূপ সুন্দর যে, পরিস্ফুট ভাবগুলির সঙ্গে সঙ্গে তদনুকূল অন্যান্য ভাবও অনুরণিত হইতে থাকে। কবিতার চরণগুলি প্রচলিত সংস্কৃত প্রথা অনুসারে সকল স্থানে দুইটি দুইটি পংক্তিতে সমাপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু মিল্টনের কবিতার ন্যায় যতি বা বিরামের স্থানগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সন্নিবিষ্ট হওয়ায়, আমাদের মতে, পদগুলি অতি সুললিত ও সুখশ্রাব্য হইয়াছে, এবং আবেগময়-ভাবপ্রকাশের অধিকতর উপযোগী হইয়াছে।

কিন্তু দত্ত সাহেবের রচনা একেবারে নির্দ্দোষ নহে। উহাতে বিশ্রামের অভাব পরিলক্ষিত হয়। যেখানে ফুৎকারও অনাবশ্যক, সেখানে প্রবল ঝটিকা ভীষণ নিনাদে গর্জ্জন করে। যেখানে কোনও প্রয়োজন নাই, সেই স্থানে মেঘাড়ম্বর ও অজস্র বারিপাতে বন্যার সৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়; সমুদ্র অকারণ ক্রোধে স্ফীত হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে, এবং সকলের অনর্থক বিরক্তির উৎপাদন

করে। দত্ত সাহেবের ন্যায় মার্জ্জিতরুচি ও প্রতিভাবান লেখকের এরূপ বাগাড়ম্বর শোভা পায় না। একই রূপক ও শব্দঘটার বারংবার পুনরাবৃত্তিও তাঁহার একটি প্রধান দোষ, এবং পাঠকের পক্ষে বড়ই বিরক্তিজনক। অপরের ভাব আত্মসাৎ করা দোষটিও যে একবারে নাই, তাহা বলা যায় না। হোমর ও ভার্জিল হইতে স্থানে স্থানে চুরী আছে এবং মিল্টন ও কালিদাস হইতেও ঐরূপ চুরী লক্ষিত হয়।

তাহার পর, ব্যাকরণের মর্য্যাদাও সকল স্থানে রক্ষিত হয় নাই। ইংরাজী পদ্ধতির অনুকরণে 'স্তুতিলা', 'স্বনিলা', 'নির্ঘোষিলা' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের ঘন ঘন প্রয়োগেও আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে। আমরা মেঘনাদবধ হইতে কোনও অংশ উদ্ধৃত করিলাম না; কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পৃথকভাবে দেখিলে কাব্যখানির দোষগুণ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ হইবে না। সমগ্র কাব্যখানি সুন্দর, কিন্তু যেমন একখানি ইষ্টক দেখিয়া অট্টালিকার ধারণা হয় না, সেইরূপ এক একটি ক্ষুদ্র অংশ পাঠ দ্বারা কাব্যখানির সৌন্দর্য্য বিচার করা অসম্ভব। ❑

মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের সমালোচকগণ প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত 'মেঘনাদবধ কাব্য' একটি এপিক বা মহাকাব্য। এক্ষণে দেখা যাউক, ইউরোপীয় এপিক ও আমাদের মহাকাব্যের মধ্যে কোনো প্রভেদ আছে কিনা, উহাদের মুখ্য তাৎপর্য একই কি না এবং 'এপিক কাব্যে'র স্থলে আমরা 'মহাকাব্য' প্রয়োগ করিতে পারি কি না।

প্রসিদ্ধ ইংরাজি আলংকারিক Hugh Blair বলেন : "এপিক কবিতার প্রকৃতি সহজভাবে এইরূপ বর্ণনা করা যাইতে পারে যে, কবিতার আকারে কোনো প্রসিদ্ধ অনুষ্ঠানের আবৃত্তি করা।" তিনি আরও বলেন : "মনুষ্যের পূর্ণতা সম্বন্ধে আমাদিগের কল্পনার পরিসর বৃদ্ধি করা, আর এক কথায়, আমাদিগের বিস্ময় ও ভক্তিরসের (Admiration) উদ্রেক করাই এপিক কবিতার উদ্দেশ্য। বীরোচিত ক্রিয়াকলাপ এবং উন্নত চরিত্রের বর্ণনা ভিন্ন এই উদ্দেশ্য কখনও সাধিত হইতে পারে না। কারণ মনুষ্য মাত্রই উন্নত চরিত্রের ভক্ত ও পক্ষপাতী। এই-সকল রচনায় বীরত্ব, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়, বিশ্বস্ততা, বন্ধুত্ব, ধর্ম, ঈশ্বরভক্তি, উদারতা প্রভৃতি উন্নত ভাব সকল অতি উজ্জ্বলবর্ণে বর্ণিত হইয়া আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে আনীত হয় এবং এইরূপে সাধু লোকদিগের প্রীতি আকৃষ্ট হয়, তাঁহাদিগের সংকল্পে ও দুঃখ দুর্দশায় আমাদিগের ঔৎসুক্য ও মমতা জন্মে, আমাদিগের হৃদয়ে উদার জনহিতকর ভাব সকল জাগরিত হয়, ইন্দ্রিয়-কলুষিত হীন কার্যের চিন্তা সকল অপসারিত হইয়া আমাদিগের মন নির্মল হয় এবং উন্নত ও বীরোচিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমাদিগের হৃদয় অভ্যস্ত হয়।" বিশেষরূপে আলোচনা করিতে গেলে এপিক কাব্যকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া দেখা যাইতে পারে—প্রথমত, কাব্যগত বিষয় কিংবা কার্য সম্বন্ধে; দ্বিতীয়ত, কর্তা কিংবা পাত্রদিগের সম্বন্ধে,—তৃতীয়ত, কবির আখ্যান ও বর্ণনা সম্বন্ধে।

এপিক কবিতাগত কার্যের তিনটি লক্ষণ থাকা আবশ্যক। কার্যটি এক হইবে, মহান হইবে ও উপাদেয় হইবে। এই তো গেল য়ুরোপীয় এপিকের সারমর্ম। এক্ষণে আমাদিগের আলংকারিকগণ মহাকাব্যের কিরূপ লক্ষণ দিয়াছেন দেখা যাউক।

'সাহিত্য দর্পণে' আছে : 'কাণ্ড-বিভক্ত কাব্যশাস্ত্র বিশেষকে মহাকাব্য বলে। উহার একটি নায়ক হয় দেবতা হইবে, নয় ধীরোদাত্ত গুণান্বিত কোনো সদ্‌বংশজাত ক্ষত্রিয় হইবে। সংকুলোদ্ভব একবংশজাত কতগুলি রাজাও উহার নায়ক হইতে পারে। শৃঙ্গার, বীর ও শান্ত—এই কয়টি রসের মধ্যে একটি রস উহার অঙ্গী এবং অন্য রসগুলি উহার অঙ্গ হইবে। উহাতে সমস্ত নাটকীয় সন্ধিগুলি থাকিবে। কখন কখন খলাদির নিন্দাবাদ ও সাধুদিগের গুণকীর্তনে উহার আরম্ভ হয়। সমস্ত পদ্যে একটি ছন্দ থাকিবে, কেবল অবসানে অন্য ছন্দ হইবে। কখন কখন উহাতে নানা ছন্দময় সর্গ দৃষ্ট হয়। উহা নাতিস্বল্প ও নাতিদীর্ঘ হইবে, উহাতে অষ্টাধিক সর্গ থাকিবে। সর্গান্তে ভাবী সর্গের কথা সূচনা থাকিবে। সন্ধ্যা, সূর্য, চন্দ্র, রজনী, প্রদোষ, অন্ধকার, ঋতু, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, মৃগয়া, শৈল, বন, সাগর, সম্ভোগ, বিচ্ছেদ, মুক্তি, স্বর্গ, নগর, যজ্ঞ, রণপ্রয়াণ, বিবাহ, মন্ত্র, পুত্রজন্ম ইত্যাদি বিষয় যথাযোগে ও সাঙ্গোপাঙ্গরূপে উহাতে বর্ণিত হইবে। কবির নামে অথবা বৃত্তান্তের নামে কিংবা নায়কের নামে কাব্যের নাম হইবে। সর্গের মধ্যে যে কথা সর্বাপেক্ষা বেশি উপাদেয়, তাহারই নামে সর্গের নাম হইবে। মহাকাব্যের দৃষ্টান্ত যথা, রঘুবংশ, শিশুপাল বধ, নৈষধ ইত্যাদি। আর্য মহাকাব্যকে আখ্যান বলেন। যথা, 'মহাভারত'।

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে মহাকাব্যের প্রকৃত লক্ষণ কী, তাহার মর্মগত তাৎপর্য কী তাহার প্রাণগত ভাব কী—সে বিষয়ে কোনো কথা প্রাপ্ত হওয়া যায় না—উহাতে কেবল বাহ্য আকার ও বাহ্য উপকরণের কথাই আছে।

এপিক কাব্যের যে-সমস্ত লক্ষণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় এপিক কাব্যগত বিষয়টি এক হইবে, মহান হইবে ও উপাদেয় হইবে। যদিও সাহিত্য দর্পণকার ঠিক এইরূপ মহাকাব্যের লক্ষণ দেন নাই, তথাপি তাঁহার বিবৃত লক্ষণগুলি হইতে য়ুরোপীয় এপিকের সারমর্মটি কোনো প্রকারে উদ্ধার করা যাইতে পারে। তিনি নায়ক ও বৃত্তান্ত বিষয়ের যেরূপ লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে মহৎ অনুষ্ঠান ও মহৎ চরিত্রের বিকাশ আপনা হইতেই সূচিত হইতেছে। তিনি যে বলিয়াছেন, মহাকাব্যে নাটকীয় সন্ধিগুলি থাকা চাই, উহাতে য়ুরোপীয় এপিক কাব্যের কাব্যগত একত্বও সূচিত হইতেছে। তাহার পর সাহিত্য দর্পণে যে আছে : সন্ধ্যা, চন্দ্র, সূর্য, রণপ্রয়াণ প্রভৃতি বিষয় মহাকাব্যে বর্ণনীয়,—তাহার তাৎপর্য এই, একটি মহৎ ব্যাপারের বর্ণনা করিতে গেলে এবং সেই বর্ণনা উপাদেয় করিতে হইলে কাব্যমধ্যে বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা করা আবশ্যক। উক্ত লক্ষণগুলি এপিক কাব্যের লক্ষণের সহিত সাধারণ একরূপ মিলাইয়া লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সাহিত্যদর্পণ যে বলিয়াছেন, শৃঙ্গার রসও মহাকাব্যের অঙ্গী হইতে পারে—এই কথাটিতে একটু গোল বাধে। কারণ শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য থাকিলে এপিক কাব্যের গাম্ভীর্য রক্ষিত হইতে পারে কি না এবং তাহাতে মহৎ ও উচ্চ ভাবের তেমন স্ফূর্তি পায় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। সে যাহা হউক,—এপিক কাব্য ও মহাকাব্যের মধ্যে ঐক্য থাকুক বা না থাকুক—ইহা নিঃসংশয়রূপে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত য়ুরোপীয় এপিকের আদর্শেই তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করিয়াছেন। অতএব য়ুরোপীয় এপিকের লক্ষণ অনুসারেই আমরা তাঁহার কাব্যের সমালোচনা করিব।

প্রথমত, দেখা যাউক, মেঘনাদবধ কাব্যের কার্যটি এক কি না। অ্যারিস্টটল বলেন, কাব্যের একত্ব এপিক কবিতার পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয়। কারণ, ইহা নিশ্চিত, যে উপন্যাস এক ও অখণ্ড, যাহাতে ঘটনাগুলি পরস্পরের উপর পরস্পর লম্বমান, এবং একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকল ঘটনাই উন্মুখ,—তাহাতে পাঠকের যতদূর মনোরঞ্জন হইতে পারে, তাহার হৃদয় যতদূর আকৃষ্ট হইতে পারে, এরূপ ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ও পরস্পর-নিরপেক্ষ ঘটনার বর্ণনায় কখনো হইতে পারে না। অ্যারিস্টটল আরও বলিয়াছেন, এই একত্ব একজন মনুষ্যের কার্যকলাপে বদ্ধ থাকিলেই হইবে না, কিংবা কোনো নির্দিষ্ট কালের ঘটনা বর্ণনা করিলেই যথেষ্ট হইবে না। কিন্তু রচনার বিষয়টির মধ্যেই একত্ব থাকা আবশ্যক। বড়ো বড়ো এপিক কাব্য মাত্রেই কার্যের একত্ব উপলব্ধি হয়। ইটালি দেশে ঈনিয়সের বাস স্থাপন—এই বিষয়টি বর্জিলের কাব্যগত বিষয়। ওই কাব্যের আদ্যোপান্তে ওই উদ্দেশ্যটি জাজ্বল্যমান। ওডিসির একত্বও এই একই প্রকৃতির। অর্থাৎ স্বদেশে য়ুলিসিসের প্রত্যাগমন ও পুনর্বসতিই উহার উদ্দেশ্য। একিলিসের ক্রোধ ও তদ্ভূত ফলাফল ইলিয়াড কাব্যের বিষয়। অখৃস্টানদিগের নিকট হইতে জেরুজালেম উদ্ধার করা ট্যাসোর এবং স্বর্গ হইতে আদমের বহিষ্করণ মিলটনের রচনাগত বিষয়। ওই সকল কাব্যেই উপন্যাসের একত্ব অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদের বধসাধন কিংবা শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের পুনর্জীবনলাভ—উহার কোন্‌টি কাব্যগত বিষয় উহা বুঝা নাও যাইতে পারে। কারণ কবি মেঘনাদের বধসাধন করিয়াই কাব্যের উপসংহার করেন নাই; তাহার পরেও লক্ষ্মণের শক্তিশেলের ঘটনা আনিয়া এবং রামকে নরক পরিভ্রমণ করাইয়া অনেকটা নিরর্থক বাড়াইয়াছেন। অ্যারিস্টটলের নিয়মানুসারে ইহাতে কাব্যগত একত্বের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইয়াছে বলিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, দেখা যাউক, মেঘনাদবধের বর্ণিত কার্যটি মহৎ ও বৃহৎ কি না। কাব্যটি মহৎ ও বৃহৎ হইলে সেইসঙ্গে সেই কার্যের কর্তাকে অর্থাৎ নায়ককেও মহাশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া অনুমান করা যায়। যদিও সমস্ত রামায়ণের মধ্যে সীতা উদ্ধারই সর্বাপেক্ষা মুখ্য ও বৃহৎ অনুষ্ঠান, তথাপি মেঘনাদের বধসাধনরূপ কার্যকে কবিবর মধুসূদন তাঁহার নিজ কাব্যে প্রাধান্য দেওয়ায় বিশেষ যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলা যায় না। যেহেতু সীতা উদ্ধারের পক্ষে মেঘনাদবধ একটি প্রকৃষ্ট ও প্রধান উপায়; যে মেঘনাদের প্রতাপে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু সর্বদাই সশঙ্কিত, তাহাকে বধ না করিতে পারিলে সীতা উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব হইত। কিন্তু কবি লক্ষ্মণ বা রামকে নায়ক না করিয়া রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে নায়করূপে নির্বাচন করায় তাঁহার কাব্যগত মহত্ত্ব ও গৌরবের বিশেষ হানি হইয়াছে সন্দেহ নাই। রাবণ কিংবা ইন্দ্রজিৎ পাশব বীরত্বেরই আদর্শস্থল। কিন্তু যে বীরত্বের সহিত ক্ষমা দয়া ন্যায় বাৎসল্য ভক্তি মিশ্রিত, সেই বীরগুণে ভূষিত উন্নত চরিত্রের মহাপুরুষই মহাকাব্যের উপযুক্ত নায়ক হইতে পারেন। মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক যে কে তাহা আমরা কাব্যের নাম মাত্র পাঠেই অবগত হইতে পারি না। কারণ, কাব্যখানির নাম মেঘনাদবধ, উহাতে মেঘনাদকেও নায়ক বুঝাইতে পারে এবং মেঘনাদবধের কর্তা লক্ষ্মণকেও নায়ক মনে হইতে পারে। তবে, আসল নায়ক ধরা পড়ে কোথায়? না, যেখানে কবি লক্ষ্মণ ও মেঘনাদকে একত্রে আনিয়াছেন। লক্ষ্মণকে তস্কর ও সর্পের ন্যায় অলক্ষিতভাবে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করাইয়া কাপুরুষের ন্যায় অন্যায় যুদ্ধে নিরস্ত্র অথচ বীরদর্পে দর্পিত মেঘনাদকে বধ করাইয়া লক্ষ্মণের চরিত্র যারপরনাই হীনবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন এবং মেঘনাদকে বীরত্ব ও উদারতাগুণে ভূষিত করিয়া নায়ক স্থানীয় করিয়া তুলিয়াছেন। মেঘনাদের পরাজয়েও জয় হইয়াছে এবং লক্ষ্মণের জয়েতেও বাস্তবিক পরাজয় হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এ বিষয়ে কবির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত—তিনি যাঁহাকে ইচ্ছা তাঁহার কাব্যের নায়ক করিতে পারেন, এবং তাঁহার পাত্রদিগকে যেরূপ করিয়া ইচ্ছা আঁকিতে পারেন। এই বিষয়ে Blair যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি যথার্থ কথা। তিনি বলেন, সকল চরিত্রকেই যে সৎ-চরিত্র হইতে হইবে এরূপ কোনো কথা নাই—স্থল বিশেষে অসম্পূর্ণ চরিত্র—এমন-কি, পাপিষ্ঠ চরিত্রেরও অবতারণা করা যাইতে পারে—কিন্তু কাব্যের যাহারা কেন্দ্রস্থল, সেই নায়কদিগের চরিত্র পাঠ করিয়া যাহাতে পাঠকের মনে ঘৃণা ও অবজ্ঞার উদ্রেক না হইয়া প্রত্যুত বিস্ময় প্রীতি ও ভক্তিরসের উদয় হয়, এরূপ রচনা করা নিতান্ত কর্তব্য। বিশেষত মাইকেল মধুসূদনের পক্ষে এ দোষটি নিতান্ত অমার্জনীয়। আপনার ছাগকে কেউ মুণ্ডের দিক দিয়াই কাটুক, কিংবা লেজের দিক দিয়াই কাটুক, সে বিষয়ে কাহারও আপত্তি না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যাহা কবির একমাত্র নিজের ধন নহে, যাহা সমস্ত ভারতবর্ষের সম্পত্তি, তাহা লইয়া এরূপ লণ্ডভণ্ড করিলে চলিবে কেন? মূল গ্রন্থে যে-সমস্ত চরিত্র উন্নত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে কবি আরও উন্নত করিয়া চিত্রিত করুন—তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সেই মূল গ্রন্থের বর্ণিত উন্নত চরিত্রদিগকে হীন করিয়া আঁকিবার তাঁহার কী অধিকার আছে? বিশেষত যাঁহারা প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ের সামগ্রী—চির আরাধ্য দেবতা—সেই রাম-লক্ষ্মণকে এরূপ হীনবর্ণে চিত্রিত করা কি সহৃদয় জাতীয় কবির উচিত? রাম-লক্ষ্মণ থাকিতে মেঘনাদকে কিছুতেই নায়ক করা যাইতে পারে না—মহাকাব্যের উপযুক্ত অত বড়ো মহান চরিত্র রামায়ণে কেন, মহাভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো কাব্যে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। তাঁহাদিগকে ছাঁটিয়া রাবণ কিংবা মেঘনাদকে নায়ক করিবার তো কোনো অর্থই পাওয়া যায় না।

সাধারণত, চরিত্র চিত্রে কবিবর মধুসূদনের ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই। মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক মেঘনাদকে আমরা অতি অল্পই দেখিতে পাই। যাহা কিছু তাঁহার চরিত্রে স্ফূর্তি পাইয়াছে সে সেই যজ্ঞাগারের দৃশ্যে। তাঁহার পাত্রদিগের চরিত্রে সূক্ষ্ম প্রভেদ সকল উপলব্ধি হয় না। রাবণও বীর,

মেঘনাদও বীর—রাবণও বিলাসী, মেঘনাদও বিলাসী। প্রভেদের মধ্যে একজন পিতা, আর -একজন পুত্র। যেমন এক জাতীয় হইলেও প্রত্যেক লোকের মুখশ্রী বিভিন্ন—সেইরূপ সাধারণত এক প্রকৃতির হইলেও প্রত্যেক লোকের চরিত্রে সূক্ষ্ম তারতম্য ও বৈষম্য লক্ষিত হয়। এই বৈষম্যগুলি পরিস্ফুটরূপে চিত্রিত করিতে পারিলে কবির বিশেষ প্রতিভা প্রকাশ পায়। এ বিষয়ে ব্যাস অদ্বিতীয়। য়ুরোপীয় কবিদিগের মধ্যে এই অংশে হোমর সর্বাপেক্ষা ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার নীচে ট্যাসো। মেঘনাদবধ কাব্যে যতগুলি পুরুষ চরিত্র আছে, তন্মধ্যে রাবণের চরিত্রই সর্বাপেক্ষা প্রস্ফুটিত ও আত্মসংগত হইয়াছে। কিন্তু মূল রামায়ণে যেরূপ রাবণের দুর্ধর্ষ প্রচণ্ড ভাব উপলব্ধি হয়, মেঘনাদবধ কাব্যে সেরূপ কিছুই পাওয়া যায় না। মূল রামায়ণেও তাঁহার বিলাপ আছে বটে, কিন্তু তাঁহার শোক ও রোষের ভাব এমন নিপুণভাবে মিশ্রিত করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, তাঁহাতে তাহার চরিত্রগত ভীষণ গাম্ভীর্যের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। মূল রামায়ণে রাবণের বিলাপ বর্ণনা করিতে করিতে এক স্থলে আছে যে, রাবণের নেত্র হইতে কিরূপ অশ্রু পতিত হইতেছিল? না, যেমন জ্বলন্ত দীপশিখা হইতে তপ্ত তৈল বিন্দু বিন্দু স্খলিত হয়। এই একটি উপমা দ্বারা রাবণের রোষদীপ্ত শোক কেমন জ্বলন্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাঁহার চরিত্র কেমন সন্দুর রূপে চিত্রিত হইয়াছে। সমস্ত বাধাবিঘ্ন বিপদকে তুচ্ছ করিয়া দানববালা প্রমীলা যে সময়ে পতি দর্শনে যাত্রা করিতেছেন সে দৃশ্যটি অতি চমৎকার—তাহা পাঠকের মনকে বীরভাবে উত্তেজিত করিয়া তোলে। সমস্ত মেঘনাদবধ কাব্যে প্রমীলার চরিত্র বেশ নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। দেবদেবীগণের চরিত্র বর্ণনা করিতে গিয়া মেঘনাদবধ কাব্যে অনেক সময় দেবোচিত গাম্ভীর্য রক্ষিত হয় নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, মেঘনাদবধ কাব্যের কার্যটি মহান হইলেও তৎসম্পর্কীয় পাত্রদিগের চরিত্রের মহত্ত্ব তেমন সুন্দর রূপে বিকশিত হয় নাই। ওই বৃহৎ কার্যটি সাধন করিবার জন্য যে-সকল সরঞ্জামের আবশ্যক, তাহা খুব জমকালো হইয়াছে সন্দেহ নাই, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল হইতে তাহার বিস্তৃত আয়োজন অত্যন্ত ঘটা করিয়া আহরণ করা হইয়াছে। বলিতে কী মেঘনাদবধ কাব্যে সরঞ্জাম ও কৌশলের অভাব নাই। কিন্তু আসল কথা চরিত্রের মহত্ত্ব বিকাশ—যাহা মহাকাব্যের প্রাণ তাহা মেঘনাদবধ কাব্যে কোথায়?

অবশেষে দেখা যাক্‌, মেঘনাদবধ কাব্য অ্যাখান ও বর্ণনা অংশে উপাদেয় হইয়াছে কি না। কাব্যগত কার্যটি বৃহৎ ও মহৎ হইলেই যে উপাদেয় হইবে এরূপ কোনো কথা নাই। কারণ, কেবলমাত্র সাহসের কার্যগুলি, যতই কেন বীরোচিত হোক না—নীরস ও বিরক্তিকর হইতে পারে। কিন্তু কবিবর মাইকেল মধুসূদন তাঁহার কাব্যমধ্যে বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা করিয়া, দেবদেবী প্রভৃতি অলৌকিক সরঞ্জাম (machinery) আনয়ন করিয়া, দুই-একটি সুন্দরী প্রকরী (Episode) প্রবর্তিত করিয়া এবং যাহাকে এপিক কবিতার পাকচক্র বলে (Intrigue) সেই নায়কদিগের বাধাবিঘ্ন সকল যথোপযুক্ত রূপে কাব্যমধ্যে বিন্যাস করিয়া তাঁহার কাব্যটিকে একরূপ বেশ উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছেন।

এপিক-কাব্যগত আখ্যান-বিন্যাসের দুই প্রকার পদ্ধতি আছে। কবি আপনার মুখেই সমস্ত উপন্যাসটি বর্ণনা করুন কিংবা তাঁহার কাব্যগত বিষয়ের পূর্ব ঘটনাগুলি তাঁহার পাত্রদিগের মুখেই বর্ণনা করুন—তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কবিবর হোমর তাঁহার ইলিয়াডে প্রথমোক্ত প্রথাটি ও তাঁহার ওডিসিতে দ্বিতীয়োক্ত প্রথাটি অবলম্বন করিয়াছেন। মাইকেল মধুসূদনও তাঁহার কাব্যগত মূল বিষয়ের পূর্ববর্তী আনুষঙ্গিক ঘটনাগুলি সীতা ও সরমার কথোপকথনে ব্যক্ত করিয়া সুকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। যদিও মাইকেল মধুসূদন চরিত্র চিত্রে বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন নাই কিন্তু বাহ্য দৃশ্যগুলি একরূপ মন্দ চিত্রিত করেন নাই; তাঁহার অনেকগুলি ছবি বেশ সজীব ও জীবন্ত। আমার বোধ হয়, প্রাকৃতিক দৃশ্য অপেক্ষা তিনি লৌকিক দৃশ্যগুলি চিত্রিত করিতে অধিক সফল হইয়াছেন। তাঁহার চিত্রকর্মের প্রণালী এই যে, তিনি প্রত্যেক খুঁটিনাটি ধরিয়া চিত্র করেন—দুই-একটি

পোঁচ দিয়া চরিত্রটিকে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন না—তাঁহার রাবণের সভা বর্ণনা—লঙ্কাপুরী বর্ণনা—রণপ্রয়াণের বর্ণনা পাঠ করিলেই ইহা উপলব্ধ হইবে। তাঁহার ভাষায় এপিক কবিতাসুলভ তেজস্বিতা ও বেগবত্তা আছে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাঁহার পাত্রদিগের কথাবার্তায় হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস নাই—অকৃত্রিম আবেগ নাই—কেমন সকলেই অভিনয় করিতেছেন বলিয়া বোধ হয়। উত্তর-প্রত্যুত্তরগুলি বেশ কাটাকাটা, সাজানো-গোছানো, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের অভাব উপলব্ধ হয়। উহাতে প্রেমের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের স্থলে নাগরিক রসিকতা, প্রকৃত শোকের স্থলে আড়ম্বরময় বিলাপ, এবং প্রকৃত বীরত্বের স্থলে আস্ফালনই অধিক প্রকাশ পায়। প্রকৃতির বর্ণনায় আমাদের কবি অধিকাংশ স্থলে পুরাতন কবিদিগেরই অনুসরণ করিয়াছেন—নূতন ভাব অতি অল্পই আছে। সেই কোকিল, সেই ভ্রমর, সেই পদ্মিনী, সেই চকোর। তাঁহার উপমাগুলি অনেক সময় কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয়, অনেক সময় মনে হয় উপমা দিবার জন্যই উপমা দেওয়া হইয়াছে। অনেক সময় তিনি অযথা স্থলে 'যথা' প্রয়োগ করিয়া রসভঙ্গ করেন। সাধারণত বলিতে গেলে অলংকারের আড়ম্বরে তাঁহার কবিতায় সরল সৌন্দর্যের স্ফূর্তি পায় না। যে সর্গে সীতা সরমার নিকট তাঁহার পূর্ব কাহিনী বলিতেছেন, —সেই সর্গটি অতি চমৎকার—উহার অনেক অংশে স্বাভাবিক কবিত্বের স্ফূর্তি আছে। স্থানে স্থানে তাঁহার রচনায় কুরুচি প্রকাশ পায়। তাঁহার নরক বর্ণনা অত্যন্ত বীভৎসজনক। যদিও ইলিয়াড ও মিলটনেও কোনো কোনো স্থলে ওইরূপ বীভৎসজনক বর্ণনা আছে, তাই বলিয়া উহা অনুকরণীয় নহে। কোনো ইংরাজ সমালোচক বলেন, ইলিয়াডের তৃতীয় সর্গান্তর্গত হার্পিদিগের উপন্যাস, এবং প্যারাডাইস লস্টের দ্বিতীয় 'বুকের' অন্তর্ভুক্ত পাপ ও মৃত্যুর রূপকটি উক্ত দুইটি প্রসিদ্ধ কাব্য হইতে পরিত্যক্ত হইলেই ভালো হইত।

কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের যতই দোষ থাকুক-না কেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ইহা সুখপাঠ্য। বিচিত্র ঘটনা ও ভাবের সমাবেশ এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের গুণে অত বড়ো গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের ক্লেশ বা ক্লান্তি বোধ হয় না, প্রত্যুত আমোদ পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আমরা উহা হইতে যে আমোদ পাই—সাধারণ মানবপ্রকৃতিসুলভ আড়ম্বরপ্রিয়তাই তাহার কারণ। রাজপথে ঘোরঘটা করিয়া, বাদ্য বাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া, লোকের কোলাহলে আকাশ পূর্ণ করিয়া, যখন চাকচিক্যময় গিল্টির সাজে সুসজ্জিত কোনো প্রতিমাকে বাহির করা হয়—তখন যেরূপ সেই দৃশ্য সাধারণ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও তাহাতে তাহারা আমোদ পায়—মেঘনাদবধ কাব্য পড়িয়া অনেক সময় আমরা যে আমোদ পাই, সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ওই প্রকারের আমোদ বলিয়া উপলব্ধি হইবে। উহাতে সহজ কবিত্বের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস অতি বিরল, কৃত্রিম আড়ম্বরপূর্ণ অলংকারে উহা পরিপূর্ণ। কাব্যখানি পাঠ করিয়া আমোদ পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না।

কিন্তু একটি কথা শেষে বলা আবশ্যক। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা পদ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করিয়া আমাদের সাহিত্যরাজ্যে একটি শুভ বিপ্লব সংসাধিত করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার রচনার স্থানে স্থানে বাংলা ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ হাস্যাস্পদ প্রয়োগ থাকিলেও শিথিল বঙ্গীয় পদ্যের সংশ্লিষ্টতা সাধন করিয়া সাধারণত তিনি বঙ্গসাহিত্যের উপকার করিয়া গিয়াছেন বলিতে হইবে। অতএব আর যদি কিছুরই জন্য না হয়, অন্তত এই উপকারটির জন্য তাঁহার নিকট আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। ❑

মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে কয়টি কথা

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

"মেঘনাদবধ কাব্যের" প্রকৃত সমালোচনা আজিও হইল না। অথচ এই রূপকপ্রিয় দেশে, কোন লেখক যদি অধুনাতন বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া "ভগবান মরিচিমালীর" সহিত ইহার উপমা দিবার লোভটুকু সম্বরণ করিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে মনে করিতে হইবে যে "মেঘনাদই" বঙ্গের "প্রদীপ্ত প্রভাত তারা!" যিনি বাঙ্গালীকে "মেঘনাদবধ কাব্য" বুঝাইতে সক্ষম তিনি বুঝাইলেন না! ভরসা ছিল, বঙ্কিম বাবু একবার সে প্রয়াস পাইবেন! কিন্তু তিনি বুঝি আর তাহা করিলেন না। কে তবে এই গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিবে? প্রবন্ধ লেখকের সে উদ্যম বুঝি কেবল ধৃষ্টতা মাত্র। তবে কথা এই যে, "মেঘনাদবধের" রীতিমত সমালোচনার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিতেছি না।

হিন্দুসন্তান মাত্রই রামায়ণের উপাখ্যানভাগের সহিত সুপরিচিত। রামের মহত্ত্ব, তাঁহাদের চরিত্রের বীরদর্প; জগতে অতুলনীয়া দোষমাত্র পরিশূন্যা সীতার কমনীয়তা, তাঁহার পতিভক্তি; লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, সেই বীর পুরুষদের চিরোজ্জ্বল, নিঃস্বার্থপর বীরভাব;—সংক্ষেপতঃ রামায়ণের সেই স্বর্গীয়ভাব, বাল্যকালাবধি হিন্দুসন্তান অনুদিন হৃদয়ে ধারণ করেন। আর সেই সঙ্গে রাবণের বংশাবলীর উপর আমাদের কেমন একটা বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়া যায়। কবির "সৌধ কিরীটিনী" লঙ্কা পাঠকের চক্ষে ভাসিতে থাকে, কিন্তু হৃদয়ে স্থান পায় না। লঙ্কার কথা মনে আসিলে নরভুক রাক্ষসের ভীষণ পাপাচার সর্ব্বাগ্রে তাঁহার মনে পড়ে। আর সেই অশোকবনে, চেড়ীদলবেষ্টিত, চিরলোকমোহিনী, জনকনন্দিনীর চিত্র মনে করিয়া তিনি ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় অশ্রুবর্ষণ করেন। ইহাই রামায়ণ! অন্ততঃ প্রথম দৃষ্টিতে রামায়ণ ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। "মেঘনাদবধ কাব্য" রামায়ণ মহাবৃক্ষের পল্লব মাত্র লইয়া রচিত। কিন্তু যেমন কেন পাঠক হউন না, "মেঘনাদবধ" পাঠকালে তাঁহার মনে হইবে, যাহা রামায়ণে নাই, "মেঘনাদে" তাহা পড়িতেছি। "মেঘনাদের" রাক্ষসকে ঘৃণা করিতে ইচ্ছা হয় না;—সে ভাবই মনে আসে না। প্রতি পদে যেন "জগতের অলঙ্কার" লঙ্কার প্রতি সহানুভূতি হয়। কবি নিজেই বন্ধুকে পত্রে লিখিয়াছিলেন, "People here grumble and say that the heart of the poet in "মেঘনাদ" is with the Rakshasas! And that is the real truth." অর্থাৎ "এদেশের লোকেরা অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া থাকে যে মেঘনাদবধ কাব্যে কবির মনের টান রাক্ষসদের প্রতি! বাস্তবিকও তাহাই বটে।" জানিয়া শুনিয়া কবি হিন্দুসন্তানের চিরাচরিত সংস্কারস্রোতের বিপরীতে কাব্যতরণী ভাসাইতেছেন! আপাততঃ ইহা বড় বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভাবুক দেখিবেন, এই প্রভেদই মেঘনাদবধ কাব্যের বীজ।

আবার রামায়ণের সেই রাবণকে মনে কর!—যেন প্রলয়ের স্থানচ্যুত গ্রহ, মিল্টনের সেই সয়তান তুল্য!—নরকে রাজ্য করিবে সেও ভাল; তথাপি স্বর্গের দ্বিতীয় অধীশ্বর হইতে চাহে না! এ দৃশ্য অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যময় বটে, কিন্তু কেমন ভয়ানক! আর "মেঘনাদবধের" রাবণ? কতকটা ভক্তিপ্রীতির আধার! তিনি নিজ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে, সেতুনিগড়বদ্ধ, চিরকল্লোলময়, চিরস্বাধীনতাময় সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া, তীব্র ব্যঙ্গের লহরী তুলিয়া বলেন—

"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!

প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শনে' ১২৮৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

হে মহাবাহু, সৃজিলা পবনে/সিন্ধু-অরি; মৃগ-ইন্দ্রে রিপু;/খগেন্দ্র নাগেন্দ্র বৈরী; তার মায়াছলে/রাঘব রাবণ-অরি—দোষিব কাহারে?' অর্থাৎ যে মৌলিক বা প্রাকৃতিক কারণে জড় ও জীবজগতে শাশ্বত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি, সেই শাশ্বত দ্বন্দ্বেরই একটি রূপ রাম-রাবণের শত্রুতা।

লক্ষণীয় যে, রাবণ যেমন নিজের পাপকর্মের কথা খুবই কম বলেছেন, পূর্বজন্মের কর্মফলের কথাও বোধ হয় একবারই বলেছেন, এবং অধিকাংশ সময়েই বিরূপ ভাগ্যের কথা বলে গেছেন, তেমনি অন্যদিকে, দেবদেবীরা রাবণের ঔদ্ধত্য ও পাপকর্মের কথা বারবার বলেছেন এবং অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে লক্ষ্মণ, বিভীষণ এবং জটায়ুও ওই পাপকর্মের কথাই পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু বসুন্ধরার মুখেই অনায়ত্ত ও পূর্বনির্দিষ্ট সেই অপ্রতিবিধেয় বিধানেরই প্রথম স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে, সরমার মুখে তার সমর্থন আছে এবং শেষ সর্গে রাবণের দূতের মুখে সেই অপ্রতিবিধেয় বিশ্ববিধানের স্বরূপটি পরিষ্কার হয়েছে। প্রথম থেকেই অনায়ত্ত শক্তির হাতে রাবণ যে অসহায় ক্রীড়নক একথা বারবার রাবণের মুখে বলালে বোধ হয় রাবণের প্রতিশোধ-সংকল্পের জোর কমে যায় ভেবেই মাইকেল অনায়ত্ত শক্তির কথা আভাসে তাঁর মুখে বলিয়েছেন। এমন কি, নিজের কর্মদোষের কথাও একবারই বলিয়েছেন তাঁর মুখে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের জ্বালার কথাও। বসুন্ধরা, সরমা এবং দূতের মুখে তিনবার মাত্র সেই অনায়ত্ত শক্তির কথা বলিয়ে হয়তো রাবণের বীরোচিত সংকল্প ও আশু কর্তব্যকেই বড় ক'রে মাইকেল দেখাতে চেয়েছেন। এবং একেবারে শেষ সময়ে, মেঘনাদের চিতায় প্রমীলাকে উঠতে দেখেই 'পূর্বজন্মফল' বলে সমস্ত চেষ্টার ব্যর্থতায় রাক্ষসলক্ষ্মীর উদ্দেশে রাবণকে দিয়ে হাহাকার করিয়েছেন। ইসকাইলাসের নাটক আগামেম্নন-এর সূচনায় ট্রয়ের সর্বনাশের আভাস থাকা সত্ত্বেও তো আগামেম্ননের কর্মদোষ দেখিয়ে 'চরিত্রই নিয়তি' এই কথা প্রমাণিত হয়েছে। পূর্বনির্দিষ্ট নিয়তির বিধান থাকা সত্ত্বেও যেমন চরিত্রের কর্মদোষ দেখাবার অদ্ভুত প্যারাডক্স্ প্রাচীন গ্রীক জীবনদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ঠিক সেই দৃষ্টিভঙ্গি রাবণের পরিণতির মধ্যেও কাজ করছে, 'পূর্বজন্মফল' বলে তাকে মাইকেল দেশীয় সাজ পরাবার যতই চেষ্টা করুন না কেন। এক জন্মেই কর্মদোষ ঘটিয়ে তো দেবতারা তাঁকে শাস্তি দিয়ে দিলেন। অন্যদিকে প্রধানত বিরূপ বিধির কথা বলেই রাবণ আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর 'প্রতিবিধিৎসায়' বীরোচিত লড়াই করে শূন্য স্বর্ণলঙ্কায় ফিরলেন! তাঁর প্রতিশোধ-স্পৃহার মূলে কোনো নৈতিক সমর্থন ছিল না বলেই তা নিছক প্রতিশোধ-স্পৃহা! রাবণের স্রষ্টা একটু বেশি elevated হয়েছিলেন বলেই প্রতিশোধ-স্পৃহাই তাঁর অস্ত্র। নইলে হয়তো বিশ্ববিধানের হাত থেকে রাবণকে মুক্ত করে 'চরিত্রই নিয়তি'—এই বাক্যটির তাৎপর্যে মাইকেল অন্য মাত্রা আনতে পারতেন। ❑

উনিশ শতকীয় নবজাগরণের পটভূমিতে মেঘনাদবধ কাব্যের নারীচরিত্র

সত্যবতী গিরি

'রেনেসাঁস' শব্দের মৌলিক অর্থ পুনর্জন্মলাভ। কিন্তু এর প্রচলিত অর্থ এখন দাঁড়িয়ে গেছে নবজাগৃতি বা নবজাগরণ। শব্দটিকে যেভাবেই ব্যবহার করা হোক না কেন রেনেসাঁস বলতে বোঝায় মধ্যযুগীয় বন্ধন থেকে মানব মনের মুক্তি, এই দৃশ্যমান জগৎ আর জীবন সম্পর্কে অন্তহীন জিজ্ঞাসা কৌতূহল আর মানুষের আত্মশক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু দেশের সব স্তরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রেনেসাঁসের অপরিহার্য শর্ত নয়। তাই সমাজ বিপ্লব ঘটেনি বলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালির রেনেসাঁসকে অর্থহীন বলা যাবে না। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় বার্ট্রান্ড রাসেলের মন্তব্য :

"The Renaissance was not a popular movement. It was a movement of a small number of scholars and artists encouraged by liberal patrons." (History of Western Philosophy, 2nd edn, London, 1961, p-488) অর্থাৎ রেনেসাঁস হচ্ছে ভাবজগতের আন্দোলন। কিছু সংখ্যক গবেষক বাংলার রেনেসাঁসকে গণজাগরণের প্রেক্ষিতে বিচার করে এর অস্তিত্বকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। দেশের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটলেই গণজাগরণ সম্ভব। বাংলাদেশে তা সম্ভব না হওয়ার কারণ ঔপনিবেশিক শাসনের সীমাবদ্ধতা। আর এজন্যই সমাজ-বিজ্ঞানী বিনয় ঘোষের পুনর্বিচারে উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁস এক রূঢ় প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়ায়—

"পণ্ডিতেরা উনিশ শতকে বাংলায় যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের কথা বলেন, সেটা কী পদার্থ? কোথায় এবং কখন জাগরণ হল? জাগল কারা? কলকাতা শহর যদি 'নবজাগৃতি কেন্দ্র' হয়, যদি রেনেসাঁর সূর্য 'জ্যোতির কনক পথে'র মতো কলকাতার আকাশে উদিত হয়ে থাকে, তাহলে কলকাতার খুব কাছাকাছি গ্রামেও, দেড়শো বছর পরেও; কেন অমাবস্যার রাতের মতো অন্ধকার? কেন অতীতের ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে গ্রামের মানুষ আজও গভীর ঘুমে অচৈতন্য? কেন পৌরাণিক যুগের স্বপ্নের ঘোরে আজও তাঁদের স্বপ্নচারিতা?" ('বাংলার নবজাগৃতি', ওরিয়েন্ট লংম্যান সংস্করণ; কলিকাতা ১৯৭৯, পৃ-১৬৪)

ঐতিহাসিক সুমিত সরকারও এই নবজাগরণ সংক্রান্ত মিথ থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন "Calcutta and the Bengal Renaissance"-এ (Calcutta the living city volume / the past edited by Sukanta Chaudhuri)। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার কোন কোন সময়ে ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির ঘটনাকে নবজাগরণ বলা যায় কিনা তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই নগরনিবদ্ধ বহুলাংশে খণ্ডিত আর অসম্পূর্ণ নবজাগরণ বাংলা ও বাঙালির নানামুখী বিকাশে একটা catalytic agent বা গোত্রান্তর সংঘটনকারী কার্যকারকের ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের মধুসূদনের নারীচরিত্র সম্পর্কিত আলোচনাও এই সূত্রকেই মেনে নিচ্ছে। আধুনিক নারীবাদী সমালোচনা নানামুখী। এর একটি সংজ্ঞা হলো -"সাহিত্যে নারীচরিত্র কীভাবে চিত্রিত হয়েছে বা নারীদের সম্বন্ধে কী জাতীয় মন্তব্য করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণ লেখক লেখিকা উভয়ের সৃষ্টি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।" আমাদের আলোচনায় এই রীতিটিকেই গ্রহণ করা হবে।

তথাকথিত নবজাগরণের সূচনায় যে প্রবল মানবতাবাদের উদ্বোধন ঘটেছিল—তার শুরু

রামমোহনকে দিয়ে। তার অন্যতম জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—"যে সময়ে ইংলণ্ডীয় মহাসভায় চ্যাথাম বার্ক, ফকস্ প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞ বাগ্মীগণের অগ্নিময় বক্তৃতা ন্যায় ও স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করিতেছিল, যে সময় আমেরিকাবাসীগণ পরাধীনতারূপ কঠোর নিগড় ভেদ করিবার জন্য প্রাণগত যত্ন করিতেছিলেন এবং ফ্রাঙ্কলিন, ওয়াশিংটন প্রভৃতি মহাত্মারা উক্ত মহদুদ্দেশ্য সাধন করার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সে সময়ে 'সভ্যতার রত্নখনি' ফরাসীভূমিতে প্রবল ঝঞ্ঝা ঝটিকার পূর্ব লক্ষণ স্বরূপ মেঘরাশি ঘনীভূত হইতেছিল;—ভলটেয়ার ও রুশোর ঐন্দ্রজালিক লেখনী স্বাধীনতা ও সাম্যের মহিমা ঘোষণা পূর্বক জাতীয় মহাবিপ্লবের দিন নিকটতর করিতেছিল, যে সময়ে ভারতবর্ষে ওয়ারেন হেস্টিংসের বুদ্ধি চাতুর্য ও প্রবল প্রতাপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দৃঢ়িকৃত হইতেছিল, সেই সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

পাশ্চাত্য শিক্ষায় সদ্যশিক্ষিত বাঙালি তখন ইংরেজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ মনে করতো। প্রসন্নকুমার ঠাকুর রীতিমতো গর্ব করে বলেছিলেন—"If we were to be asked, what government we would prefer, English or anyother, we would, one and all reply, English by all means, ay, even in preference to a Hindu government." কিন্তু এরপর ইংরেজের স্বরূপ শিক্ষিত বাঙালিরা বোঝার পরও, পরাধীন জাতির স্বাধিকার অর্জনের ক্রমাগত প্রচেষ্টা শুরু হওয়ার পরও শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি দুর্বলতা দেখা যায়।

অন্যদিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের একটা বড় দিক ছিল নারীপ্রগতির সর্বতোমুখী প্রচেষ্টা। ইংরেজের শোষণের ফলে ১৭৬৯-৭০ সালের 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' খুব দ্রুত গ্রাম-সমাজকে ভেঙে দিল। নারীসমাজের উপর শোষণ পীড়ন, আর সামাজিক নির্যাতনের পরিমাণ আরও বাড়লো। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহপ্রথা, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জনের মতো ভয়াবহ প্রথাও সমাজ-বিবেককে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতো না। মনুর বিধিবিধান নিয়ন্ত্রিত পুরুষশাসিত ভারতীয় সমাজে নারীর শোচনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রচেষ্টা শুরু হল। একাজেও অগ্রণী পুরুষ রাজা রামমোহন রায়। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদে বিশ্বাসী রামমোহনের আর এক কীর্তি ধর্মসংস্কার। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে চিন্তার সামঞ্জস্য এনে আর সেই সঙ্গে হিন্দু ধর্মসংস্কার করে তিনি নিরপেক্ষ উদারনৈতিক নারীনিগ্রহবিহীন দেশাচারবিবর্জিত মানবতামুখী ধর্মের প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। রামমোহন-পরবর্তী বিদ্যাসাগরের বিবিধ সামাজিক আন্দোলনে তাঁর বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রথা রোধ করার চেষ্টা আর সেই সঙ্গে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা রামমোহন-পরবর্তী ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হলেও বিদ্যাসাগর রামমোহনের ধর্মসংস্কার নীতিকে গ্রহণ করেন নি। নিজে সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় সংস্কার মুক্ত হয়ে শাস্ত্র থেকে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেছেন তাঁর সামাজিক আন্দোলনকে সফল করার জন্য। কারণ তিনি জানতেন উনিশ শতকের সেই সময়ে মেয়েদের মনোভাব পরিবর্তন করতে না পারলে তাঁর আন্দোলন সফল হবে না, শাস্ত্রের দোহাই ছাড়া অন্য কোনো মতই তারা গ্রহণ করবে না।

রামমোহন-বিদ্যাসাগর তাঁদের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের সহায়ক হিসেবে সাহিত্য সৃষ্টির কাজে এগিয়ে এলেন। আর অবধারিতভাবে সেখানে উঠে এলো মেয়েদের প্রসঙ্গ। বিদ্যাসাগর তাঁর 'সীতার বনবাস' আর 'শকুন্তলা'য় রামায়ণ মহাভারত দুই মহাকাব্যের দুটি নারীচরিত্রকে উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির মুখোমুখি দাঁড় করালেন। তাঁর 'শকুন্তলা' অবশ্য মহাভারতের নয়, কালিদাসের। বাঙালিদের কালিদাসের সৃষ্টির সঙ্গে পরিচয়ও উনিশ শতকীয় নবজাগরণের একটি উজ্জ্বল দিক।

নবজাগরণ যুগের উজ্জ্বল স্রষ্টা মধুসূদন ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনো সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ছিলেন না। কিন্তু প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস-কে তিনি

অভিনন্দন জানিয়েছেন সনেট লিখে। 'বীরাঙ্গনা' উৎসর্গ করেছেন বিদ্যাসাগরকে। দেশের পরাধীনতার গ্লানিও তাঁর কবিমনকে স্পর্শ করেছে। এই একই প্রাগ্রসর চেতনা থেকে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি হয়ে উঠেছে নারীর সর্বাঙ্গীণ বন্ধন মুক্তির শিল্পিত প্রয়াস। আবার এরই পাশাপাশি থাকে চিরকালের ভারতীয় নারীত্বের আদর্শের প্রতি কবির নম্রগভীর শ্রদ্ধা। তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্র কখনও পুরুষের অবিচারের প্রতিবাদে মুখর, কখনও প্রেমের অকুণ্ঠ প্রকাশে সাহসিনী, কখনও দীপ্ত অসংকুচিত যৌবনের তেজোময় লাবণ্যে উনিশ শতকের শিক্ষিত পুরুষের মানসী প্রতিমা।

হিন্দু কলেজের ছাত্র থাকার সময়ই একটি রচনা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে 'হিন্দু ফিমেল' নামে যে প্রবন্ধটি তিনি লেখেন সেখানে তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা : "The happiness of a man who has an enlightened partner is quite complete." [An Essay; on the importance of educating Hindu Females; মধুসূদন রচনাবলী, ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত; ১৯৬৫; সাহিত্য সংসদ]

হিন্দু কলেজের এক কিশোর ছাত্রের এই ঘোষণায় উনিশ শতকের সচেতন শিক্ষিত বাঙালির নারী সম্পর্কিত সামগ্রিক অভীপ্সাই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে এই Young Bengal-এর সমালোচনার তীব্রতাও লক্ষ্য করার মতো : "In India, I may say in all the oriental countries, woman are looked upon as created merely to contribute to the gratification of the animal appetites of man ...., The people of this country do not know the pleasure of domestic life." [তদেব]

মধুসূদনের এই উক্তিও কেবল ব্যক্তি মধুসূদনের নয়, সামগ্রিকভাবেই উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীদের উপলব্ধি। স্ত্রী শিক্ষার আরম্ভ ও প্রসার আন্দোলনের মূলে একদিকে ছিল দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও অন্যদিকে শিক্ষিত পুরুষের উপযুক্ত পরিশীলিত জীবনসঙ্গিনী তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা।

মধুসূদনের হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভের সময় ১৮৩৭-৪২। এর অনেক আগেই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার আন্দোলন শুরু হয়েছে, সতীদাহ প্রথাবিরোধী আইন প্রণীত হয়েছে। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে তৈরি হয় 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'। এছাড়া মেরি অ্যান কুকের উদ্যোগে ১৮২৪-এ তৈরি হয় 'লেডিজ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশান'। কিন্তু বিদেশি মিশনারিদের এই প্রচেষ্টা সেভাবে সার্থক হয় নি। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন—"An Apology for Hindu Female Education containing evidence in favour of the Education of Hindu Females"। এরও আগে রামমোহন রায় ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে সহমরণ বিষয়ে বিতর্কে নেমে প্রতিপক্ষকে বলেছিলেন—"আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?" (হিতকরী সভা, স্ত্রী শিক্ষা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, বসন্তকুমার সামন্ত; পৃঃ ২৮ থেকে পুনরুদ্ধৃত)

এইসঙ্গে নিজেদের জীবনের দুর্ভাগ্যকে জয় করার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মহিলারা নিজেরাও বিচ্ছিন্নভাবে অনুভব করেছিলেন। ১৮৩৫-এর ১৫ই মার্চের সমাচার দর্পণে শান্তিপুরের মহিলাদের শিক্ষার দাবিকে সমর্থন করে চুঁচুড়ার মহিলারা চিঠি লিখেছিলেন।

মধুসূদন 'মেঘনাদবধ কাব্য' লেখার আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল বা পরবর্তীকালের বেথুন স্কুল। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে বেথুন কৃষ্ণনগরের একটি সভায় বলেছিলেন—"For her own sake and in her own right, I claim for women her proper place in the scale of created beings. God has given her an intellect, a heart and feelings like your own and these were not given in vain." বেথুনের এই দাবিতে পুরুষের প্রয়োজনে নারীর শিক্ষিতা হয়ে ওঠার কথা বলা হয় নি; ব্যক্তি হিসেবে, স্বতন্ত্র মানুষ হিসেবে নারীর

বুদ্ধি, হৃদয়বত্তা আর অনুভূতির বিকাশের কথা বলা হয়েছে।

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের নারী চরিত্রগুলির মধ্যে এই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণই সর্বতোভাবে লক্ষ্য করা যায়। মেঘনাদবধ কাব্যের দুটি সর্গ লিখেই কবি 'কৃষ্ণকুমারী' লিখতে শুরু করেন। আবার নাটকটি শেষ হয়ে যাওয়ার পর তৃতীয় সর্গ থেকে লেখা শুরু হয় তাঁর মহাকাব্য। হিন্দু কলেজের কিশোর ছাত্রের enlightened partner-এর দেখা পাওয়া গেল এতদিন পর প্রমীলার মধ্যে। কিন্তু সেই সঙ্গে পেলাম বিদ্রোহিণী চিত্রাঙ্গদাকে। জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথের মতে—"মধুসূদন পরে বীরাঙ্গনা কাব্যে দলিত ফণিনীরূপিণী জনার যে তেজোময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, মেঘনাদবধের চিত্রাঙ্গদায় তাহারই রেখাপাত হইয়াছে।" কিন্তু দেবযানীর সঙ্গেই চিত্রাঙ্গদার সাদৃশ্য বেশি। জনা বহুপত্নীক পুরুষের অবহেলিতা পত্নী নয়, সে স্বামিপ্রেমধন্যা। পুত্রের মৃত্যুশোকে শুধু নয়, স্বামীর সঙ্গে মতের অমিলও তার যন্ত্রণার কারণ। আর সৌন্দর্যময়ী চিত্রাঙ্গদা রাবণের বহুপত্নীর একজন। সমালোচক মোহিতলাল চিত্রাঙ্গদার প্রতি রাবণের মনোযোগের কথা বললেও আমাদের মনে হয় কেবলমাত্র রূপমোহে নারীর প্রতি পুরুষের এই আকর্ষণ তাঁর পত্নীত্বের মর্যাদাকে অপমান করে।

চিত্রাঙ্গদা নিজেকে লঙ্কাপুরীর একজন সাধারণ প্রজা বলেই মনে করেন। রাবণের সঙ্গে অন্য সম্পর্ক তিনি স্বীকার করেন না। তাই রাবণের কাছে তাঁর প্রশ্ন—

> "দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম; তুমি
> রাজকুলেশ্বর; কহ, কেমনে রেখেছ,
> কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?" (১ম সর্গ, মেঘনাদবধ কাব্য, চরণ ৩৫৩-৫৫)

নিজেকে 'দরিদ্র' আর 'কাঙ্গালিনী', সেইসঙ্গে রাবণকে 'রাজকুলেশ্বর' সম্বোধন করে চিত্রাঙ্গদা তাঁর বঞ্চিত জীবনের ক্ষোভ আর বিদ্রোহকেই প্রকাশ করেছেন। রাবণের আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টাও তিনি আবেগ দিয়ে নয়, অকাট্য যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন।

মধুসূদনের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে এক সাহিত্যের ঐতিহাসিক বলেছেন— "কবির আগাগোড়া রচনায় নারীপ্রধান জীবন মূল্যবোধের কেন্দ্রবর্তিনী হয়ে আছেন জননী জাহ্নবী, ... কোথাও ব্যক্তিত্বময়ী মর্মপীড়িতা নারীরূপে, কোথাও বা স্বাতন্ত্র্যের অধিকার প্রার্থিনী বিদ্রোহিণী রূপেও।" চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের ক্ষেত্রে অন্তত আমরা সমালোচকের এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত।

এইসঙ্গে আরো একটা কথা ভেবে দেখার মতো। চিত্রাঙ্গদার অভিযোগ আর প্রতিবাদ অবরোধের মধ্যে নয়—প্রকাশ্য রাজসভায় উচ্চারিত হয়েছে। মহিলাদের শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করেও অবরোধের গণ্ডী ভেঙে বেরিয়ে আসার বিরোধিতা করেছিলেন রাধাকান্ত দেবের মতো সমাজ-সংস্কারকেরা। মধুসূদন যেন তার প্রতিবাদ করেই চিত্রাঙ্গদাকে এনেছেন অবরোধ থেকে রাজপথে। এই ঘটনাটি বাস্তবে ঘটলো ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর। প্রথম আই. সি. এস. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি Mill-এর 'Subjection of Women' পড়ে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে 'স্ত্রী স্বাধীনতা' নামে pamphlet বার করেছিলেন, তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে পাঠালেন গভর্নর জেনারেলের বাড়িতে। সমকালীন একটি পত্রিকা লিখলো—"ইতিপূর্বে কোনো হিন্দুরমণী গবর্নমেন্ট হাউসে যান নাই।" এইভাবে শুরু হলো অবরোধের বেড়ি ভাঙা।

এই প্রসঙ্গে চিত্রাঙ্গদার আর একটি ভূমিকাও লক্ষ্য করার মতো। সন্তানের ওপর পিতার তুলনায় জননীর অধিকার বেশি। এই সত্যটিকেও অনেক আগেই মধুসূদন চিত্রাঙ্গদার দাবির মাধ্যমে বাঙালি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। পাখি যেমন করে তরুর কোটরে তার শাবককে রাখে, চিত্রাঙ্গদাও তেমনিভাবে বীরবাহুকে রাবণের নিরাপদ আশ্রয়ে রেখেছিলেন। অর্থাৎ সন্তানের সঙ্গে বহুপত্নীক

রাবণের আত্মিক সম্পর্ককে চিত্রাঙ্গদা স্বীকার করেননি। যেহেতু সন্তানের লালন-পালন ও সম্প্রদানে চিত্রাঙ্গদারই পূর্ণ ভূমিকা—তাই সেই সন্তান মায়ের একার। উনিশ শতকের কাল্পনিক চরিত্র হলেও এক মহিলার কণ্ঠে এই ধরনের দাবি বুঝিয়ে দেয় মধুসূদন তাঁর যুগের তুলনায় কতখানি এগিয়ে ছিলেন।

অশিক্ষিতা হিন্দু মেয়েকে বিবাহ করে গড়ে নেওয়ার মতো মানস-প্রবণতা তাঁর ছিল না। কিন্তু শিল্পী হিসেবে উনিশ শতকের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানস-প্রতিমাকে নির্মাণ করে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। মধুসূদন মেঘনাদ-প্রমীলার দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে "pleasure of domestic life"-কেই রূপ দিলেন। প্রমীলাকে জাগাতে গিয়ে ইন্দ্রজিৎ বলেছেন—

> "উঠ, চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকান্তমণি-
> সম এ পরাণ, কান্তে; তুমি রবিচ্ছবি;—
> তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
> ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি, হে, জগতে
> আমার।—নয়ন-তারা! মহার্হ রতন!" (৫ম সর্গ, মেঘনাদবধ কাব্য, চরণ ৩৮০-৮৪)

নারী এখানে 'পূজার্হা গৃহদীপ্তি' নয়, প্রেরণাদায়িনী, মনোরঞ্জিনী। প্যারাডাইস লস্টের প্রভাবের কথা মনে রেখেও বলা যায় দাম্পত্য প্রেমেরই নিবিড় উচ্চারণে ইন্দ্রজিৎ উনিশ শতকের আদর্শ স্বামী। অন্যদিকে প্রমীলা শুধু তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা নয়, সে যৌথ পরিবারের বাধ্যবধূও বটে। তাই স্বামীর সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও শাশুড়ীর আদেশ পালন করে তাঁরই কাছে থেকে যায়।

প্রমীলাকে প্রথম দেখা যায় 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম সর্গেই। তার প্রেমিকা রূপটি এই সর্গে ফুটে উঠেছে। ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মীর কথা শুনে ইন্দ্রজিৎ চললেন লঙ্কাপুরীতে, আর প্রমীলা কেঁদে বললেন :

> "কোথা, প্রাণসখে,
> রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি?
> কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
> এ অভাগী?"

দ্বিতীয় সর্গে পরিবেশ ও পটভূমি পৃথক। প্রমীলাকে আবার পাওয়া যায় তৃতীয় সর্গে। তৃতীয় সর্গের শুরুতে কবি যে বিরহ বিধুরা প্রমীলার ছবি এঁকেছেন তা আমাদের বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহিণী রাধার কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা কৃষ্ণ-সঙ্গলাভের জন্য মথুরায় যাত্রা করেন নি। অবশ্য এটাও ঠিক যে তিনি পরকীয়া নায়িকা। তবু বলা যায়, মধ্যযুগ কেন উনিশ শতকের বাস্তব পরিবেশেও মহিলাদের পক্ষে প্রবাসী স্বামীর কাছে যাওয়ার একক প্রচেষ্টা কল্পনাতেও সম্ভব ছিল না। মধুসূদন তাঁর উনিশ শতকের 'বীরাঙ্গনা' কল্প-নায়িকাকে সেই মানসিক শক্তির অধিকারিণী করে তুলেছেন। সখী বাসন্তী শত্রু-সৈন্য পরিবেষ্টিত লঙ্কায় প্রবেশের বিপদ সম্পর্কে প্রমীলাকে সচেতন করলে তার উত্তর এখন বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় কিছু পঙ্ক্তি হয়ে উঠেছে—

> "কি কহিলি বাসন্তি? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
> বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
> কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
> দানবনন্দিনী আমি; রক্ষঃকুল-বধূ;
> রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
> আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?

পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে,
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?"

কিন্তু শুধু মানসিক শক্তি নয় প্রমীলার সাহস ও শত্রু-সৈন্যকে প্রতিরোধ করার শক্তি তাঁর যুদ্ধাস্ত্রশোভিত আড়ম্বরময় প্রস্তুতি বর্ণনায় প্রকাশিত। যোদ্ধৃবেশিনী প্রমীলার বর্ণনায় কবি তাঁর সৌন্দর্য ও বীরত্বকে একই সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁকে তুলনা করেছেন মহিষাসুর-মর্দিনী দেবী হৈমবতীর সঙ্গে। লঙ্কাযাত্রার আগে সখীবৃন্দের প্রতি প্রমীলার উক্তিটি তাঁর বীরত্বের চূড়ান্ত প্রকাশ—

"পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি; জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে;—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম;
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে!
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানবি;—
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষত-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে!"

কিন্তু সেইসঙ্গে পরমুহূর্তেই এক সুন্দরী তরুণীর কৌতুকপ্রিয়তা চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছে :

"দেখিব যে রূপ দেখি সূর্পণখা পিসী
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী-বনে;"

প্রমীলার এই বীরাঙ্গনা মূর্তি অঙ্কনে কবি দেশি বিদেশি নানা কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। ভার্জিলের 'Aeneid' মহাকাব্যের বীরনারী Camilla, তাসোর "Jerusalem Delivered" মহাকাব্যের Clorinda, গ্রীকপুরাণে বর্ণিত আমাজন রমণীগণ (বিশেষ করে কুইনটাস অব স্মার্না কর্তৃক চতুর্থ শতকে রচিত 'Where Homer Ends"-এর কথা মনে আসে), কাশীরামের 'মহাভারতের' প্রমীলা, রঙ্গলালের 'পদ্মিনী' কবিকে প্রেরণা দিয়ে থাকবে। তবে বাংলা ধর্মমঙ্গল কাব্যে কলিঙ্গা, কানড়া ও লখা ডোমনীদের মতো বীরাঙ্গনা চরিত্রগুলির সঙ্গে মধুসূদনের পরিচয় ছিল বলে মনে হয় না। এক্ষেত্রে 'জগদ্রামী রামায়ণ' তাঁকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। প্রমীলার মধ্যে কবি একই সঙ্গে প্রেম আর বীর্য, লাবণ্যময় কোমলতা আর খরোজ্জ্বল তেজের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সে শ্বশুর রাবণ আর স্বামী মেঘনাদের মতোই বীরকাব্যের উপযোগী চরিত্র। প্রমীলার যুদ্ধসজ্জা টাসোর নায়িকা ক্লোরিণ্ডার মতোই :

Clorinda on the corner town alone.
In silver arms like rising cynthia shone,
Her rattling quiver at her shoulders hung,
Therein a flash of arrows feathered weel.
In her left hand her bow was bended strong,
Therein a shaft headed with mortalsteel,
Sofit to shoot Latona's daughter stood,
When Niobe he killed and all her brood.

কাশীরাম দাসের মহাভারতেও প্রমীলা রাজ্যের রানীর মতো বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে—

"আমাকে জিনিতে নাহি পারে ত্রিভুবনে।
মোর ভয়ে কাঁপয়ে যতেক দেবগণে।।
পার্বতীর বরে কারে ভয় নাহি করি।
হাতে অস্ত্র কেহ না আইসে মোর পুরী।।

যতেক অবলা দেখ বিক্রমে বিশাল।
আমার ভয়েতে কাঁপে অষ্টলোকপাল।।"

তবে এই বীরাঙ্গনাদের সঙ্গে মধুসূদনের প্রমীলার পার্থক্যও স্পষ্ট। সে বীরাঙ্গনা, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তার বীরত্বের পরীক্ষা হয় নি। যুদ্ধসাজে আর সাহসিকতায় তার অনন্যতার পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। তার নির্ভীকতা আসলে 'প্রেমের বীর্যে অশঙ্কিনী' নারীর নিজেকে প্রকাশ। তাই এই সমস্ত প্রভাব নিতান্তই বহিরঙ্গের ব্যাপার। প্রমীলা উনবিংশ শতাব্দীর আদর্শ নারী প্রতিমা। তার বীরত্ব আর নির্ভীকতা পুরুষেরই জন্য। তাই রামচন্দ্র প্রমীলার দূতীকে বলেন—

"কহ তাঁরে শত মুখে বাখানি, ললনে,
তাঁর পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা—"

প্রমীলার সহমরণ প্রসঙ্গ আমাদের একটু সংশয়ে ফেলে দেয়। মধুসূদনের মতো আধুনিক মানুষ ব্যক্তিগতভাবে সহমরণ প্রথাকে সমর্থন করতেন একথা বোধহয় কোনোমতেই বলা যায় না। কিন্তু এক্ষেত্রে হয়তো শিল্পী মধুসূদন মহাকাব্য রচনা করতে বসে ভেবেছেন যে রাবণের ট্র্যাজিক হাহাকার, তার সর্বরিক্ত জীবনের অতলস্পর্শী শূন্যতা, 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ' মেঘনাদ-প্রমীলার দাম্পত্য সম্পর্কের মহিমান্বিত মাধুর্যের উদ্ভাস এই সহমরণ ছাড়া সার্থক হবে না।

প্রমীলা মধুসূদনের মানসকন্যা। তাঁর উজ্জ্বল আবির্ভাব, নিষ্পাপ তারুণ্যের দীপ্তি, মৃত্যুর অন্ধকারে হারিয়ে গেছে, আর অশোকবনের বিষণ্ণ অন্ধকারে থেকে অশ্রুময়ী সীতা শেষপর্যন্ত মুক্তি পেয়েছেন। সীতা মধুসূদনের কাছে "ভারতীয় নারীর জীবনের দুঃখলাঞ্ছিত অপমানিত সত্তার প্রতিমূর্তি" (মধুসূদনের কবিমানস; শিশিরকুমার দাশ, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড)। তাঁর সৃষ্টির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে সীতার প্রসঙ্গ। ইউরোপে থাকার সময় তিনি সীতা চরিত্র অবলম্বনে ইংরেজিতে একটি কাব্য রচনা আরম্ভ করেছিলেন। 'পদ্মাবতী' নাটকে অশোককাননে ক্রন্দনরতা সীতাদেবীর প্রসঙ্গ আছে। সীতাকে নিয়ে 'সীতা বনবাসে', 'রামায়ণ' ও 'সীতাদেবী'—এই তিনটি সনেট তিনি রচনা করেছেন। নারীত্বের ভারতীয় আদর্শের চূড়ান্ত পরিচয় সীতার মধ্যেই নিহিত। মধুসূদন তাঁকেই হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তাঁর সাহিত্যে। সেই সঙ্গে লাঞ্ছিতা নারীর প্রতি সহানুভূতিও যুক্ত হয়েছে।

'মেঘনাদবধ কাব্যে' প্রথম সীতাকে দেখা যায় চতুর্থ সর্গে। লঙ্কাপুরীতে তখন উৎসবের উল্লাস। তারই মাঝখানে :

"একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে!"

তবে মধুসূদন-কল্পিত সীতা চরিত্রের আর একটি অভিনবত্বের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বনবাসিনী সীতার প্রকৃতি-প্রীতি তাঁর চরিত্রে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। রাজনন্দিনী হয়েও অরণ্য প্রকৃতির সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। অরণ্যের পশুকে দিয়েছেন মায়ের মমতা—

"অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে,
মহাদরে; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।"

সীতার এই করুণা শত্রু রাবণের প্রতিও বিস্তৃত হয়েছে। সরমা সীতার সর্বনাশের জন্য রাবণকে অভিযুক্ত করলে সীতা সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করে বলেছেন—তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর অলঙ্কার খুলে ফেলেছেন। সুতরাং এজন্য যেন রাবণকে দায়ী না করা হয়। মেঘনাদের মৃত্যু সীতার মুক্তিকেই ত্বরান্বিত করে তুলেছে। কিন্তু লঙ্কাপুরীর এই করুণ ঘটনাও সীতার সহানুভূতিতে সিক্ত; এমনকি ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর জন্য তিনি নিজেকে দায়ী করেছেন—"মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে"। মধুসূদনের সীতা চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল তিনি রাজপ্রাসাদের অবরোধ থেকে বেরিয়ে অরণ্য প্রকৃতির প্রসারিত মুক্তিতে জীবনের আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন। দাম্পত্য সম্পর্কের বাধাহীন মধুর বিনিময়ে গড়ে তোলা সেই স্বপ্নজগৎ। এও নারীর অবরোধ মুক্তির ইঙ্গিতবাহী।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র আর এক নারী মন্দোদরী যেন বাঙালি যৌথ পরিবারের আদর্শ গৃহিণী ও জননী। তাঁর মাতৃত্বের সেই গৌরব মধুসূদনের উপমা নির্মিতিতে উজ্জ্বল—

"শরদিন্দু পুত্র; বধূ শারদ-কৌমুদী;
তারা-কিরীটিনী নিশিসদৃশী আপনি
রাক্ষস-কুল ঈশ্বরী!"

পুত্র ও পুত্রবধূর প্রতি তাঁর স্নেহে কোথাও পক্ষপাতিত্ব নেই। তাই পুত্রের অনুপস্থিতিতে পুত্রবধূকে দেখেই তিনি সান্ত্বনা পেতে চেয়েছেন। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর মন্দোদরী চিত্রাঙ্গদার মতো রাবণের প্রতি কোনো তিরস্কার বাক্য উচ্চারণ করেননি। শুধু সপ্তম সর্গে রণোন্মত্ত রাবণের সামনে নীরবে এসে—'রাজপদে পড়িলা মহিষী'। এই মন্দোদরীর সঙ্গে কবি তুলনা করেছেন 'শিশুশূন্য নীড়ের আকুলা কপোতী'-র। অভিমানে অনুযোগে নয়, নির্বাক বেদনায় তিনি তাঁর অপরিসীম পুত্রশোক প্রকাশ করেছেন, নীরবতা দিয়েই স্বামীকে যুদ্ধযাত্রা থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন। এই মন্দোদরী ঐতিহ্য-বাহিত ভারতীয় নারীত্বেরই প্রতীক। রাবণের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য সম্পর্ক পারস্পরিক সহমর্মিতায়, শ্রদ্ধায় ও প্রেমে সার্থক। তাই পুত্র শোকাতুরা মন্দোদরীকে বৃথা সান্ত্বনা দেবার কোনো চেষ্টাই রাবণ করেননি। বরং দু'জনের এই দুঃখের ভার দু'জনকেই বইতে হবে—অপূর্ব কারুণ্য আর মমতায় সস্নেহে তাঁকে সেই কথাই জানিয়েছেন—

"বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব!
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ।"

রাবণ-চিত্রাঙ্গদার সম্পর্কে এই পারস্পরিকতা নেই। চিত্রাঙ্গদার সংলাপে অবহেলিত নারীত্বের ক্ষুব্ধ বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ নবজাগরণ-যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেই তুলে ধরে। আর মন্দোদরী হয়ে ওঠেন ভারতীয় নারীত্বের ঐতিহ্য-নির্মিত আদর্শ প্রতিমা। রাবণ-মহিষীর উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্বের প্রকাশও ঘটেছে মন্দোদরীর এই নীরব শোকের অভিব্যক্তিতে।

মেঘনাদবধ কাব্যে সীতার পাশে যে নারী চরিত্রটিকে মধুসূদন তাঁর সান্ত্বনার জন্য রেখেছেন তিনি সরমা। সীতা আর সরমার কথা বলতে গিয়ে কবি বলেন—

"সুবর্ণ-দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশদিশ।"

সীতা তুলসীর মতোই পবিত্র, আর স্বর্ণলঙ্কার কুলবধূ বিভীষণ পত্নী সরমা উজ্জ্বল সোনার প্রদীপ, কিন্তু তাঁর উজ্জ্বলতা ভক্তিনম্রতায় ভাস্বর। সরমার চরিত্রটি মধুসূদন সৃষ্টি করেছেন সীতার বেদনাবিধুর একাকিত্বের সহমর্মী এক সখীরূপে। নারীর যে কল্যাণময়ী মমতা-স্নিগ্ধ রূপ তিনি বাঙালি পরিবারে দেখেছেন সরমা তারই প্রতিভূ। মধুসূদন তাঁর সাহিত্যে অবরোধবাসিনীকে মুক্তির আকাশ যেমন দেখিয়েছেন তেমনি তারই শুশ্রূষায় আর সমবেদনায় সংসারের মঙ্গলরূপের কথাও ভোলেন নি। ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর এই শ্রদ্ধারই পরিচয় আছে সরমা সম্পর্কে সীতার উক্তিতে—

"মরুভূমে প্রবাহিনী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ! সুশীতল ছায়ারূপ ধরি,
তপন-তাপিত আমি, জুড়ালে আমারে!"

মেঘনাদবধ কাব্যে দেবী পার্বতীর চরিত্রে গ্রীক পুরাণের দেবরাজ পত্নীর প্রভাব আছে—একথা সমালোচকেরা অনেক আগেই বলেছেন। এই প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী সমালোচকদের অনুসরণ করে আমরাও বলতে পারি, দেবী পার্বতীর যে দুটি রূপ আমরা পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে দেখেছি তার একটি কলহপরায়ণা দারিদ্র্যক্লিষ্টা বাঙালি বধূর আর অন্য রূপটি দানবদলনী মহাজননীর। মধুসূদন দেবীর এই দুই রূপকে বর্জন করে মোহময়ী রমণীর যে রূপ এঁকেছেন তা গ্রীক পুরাণ থেকেই পাওয়া। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এই দেবী পার্বতীই আহত কার্তিককে দেখে ব্যাকুলভাবে বলেন—

"বিদরিছে হিয়া
আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা
বাছার কোমল দেহে।"

এই ব্যাকুলতা এক সন্তান স্নেহাতুরা বাঙালি মায়ের।

এভাবেই মধুসূদন তাঁর চিত্রাঙ্গদা, মন্দোদরী আর পার্বতীর মধ্যে শাশ্বতী-জননীর স্নেহাতুর মমতার্দ্র হৃদয়কে উন্মোচিত করেন। অথচ তাঁর আশ্চর্য নৈপুণ্যে প্রত্যেকেই তাঁদের নিজস্বতায় পৃথক ব্যক্তিত্ব হয়ে যান।

মেঘনাদবধ কাব্যে মূলত নারীর দুই রূপ। একদিকে আছেন দাম্পত্যপ্রেমের দুই ভিন্ন রূপ—প্রমীলা আর সীতা। আর অন্যদিকে মাতৃত্বের প্রতিমা-ত্রয়ী—মন্দোদরী, চিত্রাঙ্গদা আর দেবী পার্বতী।

কিন্তু এছাড়াও মেঘনাদবধ কাব্যে নিতান্ত অল্প উপস্থিতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে আরও দুটি নারীচরিত্র। এঁদের একজন দেবী লক্ষ্মী আর একজন প্রমীলার সখী নৃমুণ্ডমালিনী। বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না দেবী লক্ষ্মীর প্রথম সংলাপে আছে যুদ্ধবিধ্বস্ত লঙ্কাপুরীর শোকার্ত নারীদের জন্য গভীর বেদনার প্রকাশ :

"ওই যে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিছ, মুরলে,
অন্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পুত্রশোকে
বিকলা। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী।
বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবানিশি
প্রমদা-কুল-রোদন! প্রতিগৃহে কাঁদে
পুত্রহীনা মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী।"

দেবী লক্ষ্মীর এই সংলাপে শিল্পী মধুসূদন লক্ষ্মীর সহানুভূতি নয় তাঁর নিজের আর্তিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। মেঘনাদবধ কাব্য রচনার ঠিক আগেই ঘটে গিয়েছে সিপাহী বিদ্রোহ। সেই অভিজ্ঞতাও হয়তো কাজ করেছে এখানে। যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব পুরুষের মৃত্যু ঘটায়, আর মৃত্যুর চেয়েও নিদারুণ অবস্থায় ফেলে যায় নারীকে। মধুসূদনের সময়ের বেশ কিছু দিন পর নজরুল লেখেন—

"কোন রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে।
কত বধূ দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নেই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি, কত বোন দিল সেবা।
বীরের স্মৃতির স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা।।"

এই পংক্তিগুলো থেকে মধুসূদনের উত্তরাধিকারী নজরুলকেই আমরা সনাক্ত করতে পারি।

তবে দেবী লক্ষ্মীর এই বেদনা সম্পর্কে কিছুটা সংশয় জাগে—যখন দেখা যায় লঙ্কাযুদ্ধে ষড়যন্ত্রী দেবতাদের মধ্যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। এমন কী ধাত্রীমাতার ছদ্মবেশে প্রমোদ উদ্যানের নিশ্চিন্ত আনন্দ থেকে মেঘনাদকে যুদ্ধের মাঝখানে তিনিই টেনে এনেছেন। আসলে দেবতা চরিত্রের এই অবনমন গ্রীক পুরাণের সমৃদ্ধ পাঠক মধুসূদনের পক্ষেই তো স্বাভাবিক!

নৃমুণ্ডমালিনী প্রমীলার সখীদের মধ্যে বিশিষ্ট। প্রমীলার লঙ্কাপুরী যাত্রার আয়োজনে সে-ই :

"সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে,
মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে
আনন্দে।"

লঙ্কাপুরীর পশ্চিমদ্বারে উপস্থিত প্রমীলাও তার নারীবাহিনীকে হনুমান পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে নৃমুণ্ডমালিনীই সদম্ভে নিজেদের পরিচয় দিয়েছে। বীর হনুমানকে অনায়াসে বলেছে—

"কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী!
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে?"

এই আত্মসচেতন অহঙ্কার আর তেজের সঙ্গে তার চরিত্রে মিশেছে সৌজন্য আর শিষ্টাচারবোধ। রামচন্দ্রের সামনে উপস্থিত নৃমুণ্ডমালিনী বলেছে—

"প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত গুরুজনে;—নৃ-মুণ্ডমালিনী
নাম মম; দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী,
বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী,
তাঁর দাসী।"

আসলে প্রমীলার শ্রেষ্ঠ সহচরীর এই উজ্জ্বল ছবি আঁকা হয়েছে প্রমীলাকেই উজ্জ্বলতর করে তোলার জন্য। এই তৃতীয় সর্গেই কবি হনুমানের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন শুধু লঙ্কাপুরীর নারীদের চেয়ে নয়, প্রমীলা সীতার চেয়েও সুন্দরী। সৌন্দর্যের পর যোদ্ধৃবেশধারিণী প্রমীলার বর্ণনায় কবির অসামান্য উপমা নির্মাণে তার তেজ আর শ্রেষ্ঠত্বের মহিমাকেও চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন উপমার ব্যবহারেই :

"সিংহপৃষ্ঠে যথা
মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গা; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী; খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্ররমণী।"

ভারতীয় হিন্দু-ঐতিহ্যে তিন শ্রেষ্ঠ দেবীর মহিমা নিয়ে প্রমীলার এই অসামান্য রূপ নির্মাণের কারণ আবার মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক, মধুসূদনের favourite ইন্দ্রজিৎকেই মহিমাদান।

প্রথম সর্গে বারুণী-মুরলার প্রসঙ্গে বলা যায় তাঁদের চরিত্রে বিশেষত্ব সেভাবে নেই। মধুকবির কল্পনা পাশ্চাত্য প্রভাবকে মিলিয়ে কাব্যের প্রয়োজনে এই দুটি চরিত্রকে সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয় সর্গে দেবী পার্বতী ছাড়া আছেন দেবরাজপত্নী শচী। ইন্দ্রজিৎ হত্যার ষড়যন্ত্রে তাঁরও সক্রিয় ভূমিকা আছে। তিনি স্পষ্টভাবেই দেবী কাত্যায়নীকে বলেছেন—

"নাশি মেঘনাদে,
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে;"

ইন্দ্রজিৎ-হত্যার ষড়যন্ত্রে আর একজন দেবীকেও যুক্ত করা হয়েছে। শিবের পরামর্শে দেবরাজ ইন্দ্র দ্বিতীয় সর্গে মায়াদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অস্ত্র নিয়েছেন। এই ঘটনায় হোমারের মহাকাব্যের ঘটনার প্রভাব আছে। হোমারের দেবী থেটিস দেবশিল্পী হেফাইস্টোসকে দিয়ে দিব্য অস্ত্র গড়িয়ে পুত্র আথিল্লেওসের কাছে দিয়েছিলেন হেক্টরকে বধ করার জন্য।

এরপরও দেবী মায়া প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্মণকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কারণ তিনি জানেন :

"হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,
দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে
রাবণিরে।"

ষষ্ঠ সর্গে মায়া তাঁর এই প্রতিশ্রুতি পালনে চূড়ান্তভাবে বিশ্বস্ত। অসহায় নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞের শঙ্খ, ঘন্টা, উপহারপাত্র নিক্ষেপ করে লক্ষ্মণের আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করলে—

"মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম-সঞ্চালনে!"

অষ্টম সর্গে দেবী গৌরীর আদেশে আবারও মায়াদেবী প্রেতপুরীতে রামচন্দ্রকে সাহায্য করার জন্য তাঁর সঙ্গী হয়েছেন। সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে মায়ারই সাহায্যে রামচন্দ্র দশরথের কাছে উপস্থিত হতে পেরেছেন। ভারতীয় হিন্দু পুরাণে মায়াদেবীর অস্তিত্ব নেই। গ্রীক পুরাণ থেকেই মধুসূদন এই দেবীর পরিকল্পনা করেছেন।

এইভাবে উনিশ শতকের শুধু নয়, বাংলা সাহিত্যের একমাত্র সার্থক কৃত্রিম মহাকাব্যের নারী চরিত্র সৃষ্টিতে আমরা একই সঙ্গে খুঁজে পাই ভারতীয় নারীত্বের আদর্শে শ্রদ্ধাশীল, নবজাগরণ যুগের প্রগতিচেতনার দিশারী আর ক্ল্যাসিক বিশ্বসাহিত্যের বিদগ্ধ পাঠক মধুসূদনকে। ❑